প্রশস্ত হলঘরে

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়

সেণ্ট্রাল লাইব্রেরী
১৫/৩, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট
কলিকাতা - ১২

প্রকাশক :
শ্রীসুধীরচন্দ্র রায়
১৫/৩, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা—৭০০০১২

প্রথম প্রকাশ : ভাদ্র, ১৩৭২

প্রচ্ছদ : শ্রীরঞ্জিত কুমার দাস

মুদ্রাকর :
শ্রীমনোরঞ্জন নায়ক
শঙ্কর প্রেস
৩৭/১/১, শিবনারায়ণ দাস লেন
কলিকাতা-৭০[illegible]০৬.

উৎসর্গ

প্রদোষ চট্টোপাধ্যায়

কল্যাণবরেষু

PRASASTA HALGHARE

A Bengali Novel

by

Atin Bandhopadhayay

এক

বাড়িটার নাম 'গুপ্ত নিবাস'। সদর থেকে নুড়ি বিছানো পথ এবং ইউক্যালিপটাসের গাছ আর দুপাশে সবুজ লন, পেছনে কি আছে বোঝা যায় না। শহরের ওপর এতবড় বাড়ি কম, এবং ফ্যাসান বলতে প্রায় যাদুকরের সামিল এর ইঁট কাঠ, যেন দূর থেকে যারা হেঁটে যায়, তারা ভেবে ফেলতে পারে—বাড়িতে কেউ থাকে না। একটা খালি বাড়ি পড়ে আছে। অথবা যারা ছিল এইমাত্র কোথাও বের হয়ে গেছে। বাগানে দু একজন মালি সব সময় গাছে জল দিচ্ছে, দামী দামী ফুলের গাছ, ডালপাতা কেটে এ-বাড়ির সৌখিন মানুষটির জন্য ফিটফাট রেখেছে।

পরিচ্ছন্ন ঝকঝকে বাড়ি। গাড়ি বারান্দায় ঠিক দশটা বাজলে একটা সাদা রঙের গাড়ি লেগে থাকে। সকালে, এই খুব সকালে দেখা যায়, একটা জানালা খোলা। জানলায় ছোট্ট মেয়ে, এই ফ্রক পরা মেয়ের চুল ফাঁপানো অথবা বলা যেতে পারে রেশমের মতো চুল তার। চোখ বড় বড়। এবং নরম মুখশ্রী। মেয়েটি এ-বাড়ির মেয়ে মনে হবে না। কেমন একা একা, কখনও দেখা যাবে লনের ভেতর দিয়ে ছুটছে। আর তখন গীতা চিৎকার করবে, খুকুদিদিমণি ছুটবে না।

আর যা ভয়, এ-বাড়ির কর্তা মানুষটি পার্লারে বসে আছেন। মুখে সব সময় দামী চুরুট। সকালে শুধু ফলের রস, তারপর লেবু চা, তারপর ফাইল পত্র নিয়ে আসবে নিশিনাথ। ফাইলের ভেতর মুখ গুঁজে কি দেখে যাবেন সারা সকাল। তখনই হঠাৎ খুকুদিদিমণি বাবার ঘরে ঢুকে যাবে, হয়তো শীতকাল, খুকুদিদিমণির কোটের নিচে কি লুকানো।

গীতার গলার স্বর খাটো হয়ে যায়। সে যেন জীবনেও জোরে কথা বলেনি। গীতার বয়স এই ত্রিশ বত্রিশ, সাদা জমিনের ওপর নীল

পাড়, ঠিক এ-বাড়ির আয়া কি আয়ি-মা বোঝা যায় না, ওপরে উঠে গেলে চাকর-বাকরদের সঙ্গে ভীষণ দাপট, কেবল নিচে এই পার্লারের সামনে সে জোরে কথা বলতে পারে না, যেন এখানে এলেই গলার শব্দ ফ্যাস ফ্যাসে হয়ে যায়—একটা কি ভয় লুকানো আছে ভেতরে। সে ডাকল, খুকুদিদিমণি লক্ষ্মী আমার। এদিকে এস।

খুকুদিদিমণি বাবার পেছনে টুক করে ডুবে গেল।

বাবা বললেন, খুকু দুষ্টমী করবে না। ওপরে যাও।

খুকু কিন্তু যেমন ছিল, ঠিক তেমনি আছে ; কেবল মনে হয় পেটের নিচে সে যা লুকিয়ে রেখেছিল, তা আর থাকতে চাইছে না।

এবং ডেকে উঠলেই ভয়াবহ ব্যাপার। গীতামাসি তাকে নিয়ে হাত পা পরিষ্কার করে দেবে। জামা খুলে দেবে। শীতকালে ওর সকাল সকাল জামা খুলতে ভাল লাগে না। তাকে গীতামাসি কষ্টের ভেতর ফেলে দেবে। কেবল গীতামাসি বাবাকে ভয় পায়। এখানে এসেই সে হামাগুড়ি দিয়ে টেবিলের তলায় ঢুকে গেল।

গীতা বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। এখানে সে বেশি সময় দাঁড়াতে পারবে না। বাইরের লোকজন আসতে পারে। এটা বাড়ির সদরের কাছাকাছি। সে কেমন নিজেকে আড়াল দিয়ে ফের ডাকল, খুকুদিদি-মণি এস। খাবে। খাবে না বললে সে ধরা পড়ে যাবে। আসলে খুকুদিদিমণি একটা বেড়াল ছানা কোত্থেকে পাকড়েছে। ওটা সে লুকিয়ে রেখেছে কোটের তলায়। এটা যদি কোনরকমে গুপ্তসাবের সামনে পড়ে যায়, তবে গীতা দত্ত এবং ওরফে এ-বাড়ির রাত্রির ছায়া-হরিণীর কিছুটা দুঃখ কপালে লেখা থাকবে। সে বলল, এস বলছি।

গুপ্তসাব বললেন, খুকু দুষ্টমী করবে না। মাসী ডাকছে যাও।

তখন খুকুদিদিমণির বগল থেকে সেই বেড়ালছানা লাফিয়ে নেমেছে। এবং নেমেই দু'লাফে গুপ্তসাবের কোলে। তিনি হা হা করে উঠে দাঁড়িয়েছেন। রাতের পোষাক নটা না বাজলে ছাড়েন না, সেই রাতের পোষাকের ভেতর গলে গেল বেড়ালটা—আর তিনি কি

করবেন, চিংকার, খুকু কোত্থেকে তুমি এ-সব যে ধরে আনো। গীতা তুমি কোথায় থাকো সারাদিন, মেয়েটা দিন দিন জংলী হয়ে যাচ্ছে। যেখানে যা পাবে কুড়িয়ে আনছে।

গীতা আর বাইরে দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না। সে ভিতরে ঢুকে প্রায় পাঁজাকোলে করে তুলে নিল খুকুদিদিমণিকে। হাত পা ছুড়ছে। সে কিছুতেই যাবে না। আঁচড়ে কামড়ে শেষ করে দিচ্ছে। এবং তখন বেড়ালছানা লাফিয়ে মেঝেতে পড়ল। গুপ্তসাব টেবিলের ওপর দাঁড়িয়ে দেখছেন, কোনদিকে যাচ্ছে। নোংরা একটা বেড়ালছানা, শীতে নাক থেকে সর্দি ঝরছে, আর লোম ওঠা, ছাইগাদা থেকে তুলে আনা যেন— তিনি কি যে করেন। গীতা কিছুতেই পারছে না মেয়েটাকে সামলাতে।

তিনি নিজে এবার ডাকলেন, খুকু।

খুকু স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে গেল।

—যাও। গুপ্তসাব ধমক দিলেন।

খুকু দাঁড়িয়ে থাকল। এক পা নড়ল না। খুকুর চুল মুখে এসে পড়েছে। বব কাটা চুল। ঘন রেশমের মতো নরম। চোখ ভারি। বয়স তাঁর দশও হবে না। সে পরে আছে লম্বা শীতের পোষাক। দামী কোট। কোটের নিচে এতক্ষণ বেড়ালছানাটা যেন চুপ করেছিল। এখন ওটা আলমারির নিচে ডাকছে মিউ মিউ। ভীষণ শীতে কষ্ট পাচ্ছে। কষ্ট না পেলে বেড়ালছানাটা এভাবে ডাকত না। খুকুর ভারি কষ্ট হচ্ছিল বেড়ালছানাটার জন্য।

গুপ্তসাব বললেন, তোমরা কোথায় থাকো।

গীতা দরজার এ-অংশে দাঁড়িয়ে। সাদা বারান্দা পার হয়ে এক-ফালি কারুকার্যময় দেয়াল। নানাবর্ণের লতাপাতা ঝোলানো। দামী দামী সব অর্কিড, আর লনের দু পাশে দেখা যায় সব ফুলের বাহার। গীতা কি করবে বুঝতে পারছিল না।

গুপ্তসাব বেল টিপলেন। ঠিক সুইং ডোরের ও-পাশে বসে রয়েছে রহমান। না ডাকলে আসে না। খুব বয়স হয়েছে। সে চোখেও

কম দেখে। সাব ডেকেছেন, দৌড়ে আসার স্বভাব। কিন্তু চোখে কম দেখতে পায় বলে, কিছুটা ধীরে ধীরে সে এসে ঢুকতে গুপ্তসাব বলল, ওটা ফেলে দিয়ে এস। রাস্তা পার করে দেবে। খুব দূরে, যেন খুকু এর খোঁজ না পায়।

রহমান বেড়ালছানাটাকে দেখতে পাচ্ছে না। দামী গাউনের ভেতর গুপ্তসাব দাঁড়িয়ে আছেন। দু পকেটে ওর হাত। এখন কাজের সময়; এখন সব কাগজ তিনি দেখবেন। মজুমদার ওদিকের চেম্বারে আছে। সে খুব সকালে চলে আসে। কাগজে জরুরী সব টেণ্ডার নোটিশে সে লাল দাগ মেরে দেয়। তিনি সে সব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেন। এবং যাদের সঙ্গে যোগাযোগ করলে—অর্থাৎ কি করে ঠিক ঠিক জায়গায় টাকা ঢাললে কাজটা হাসিল হবে, অর্থাৎ সবাই টাকার কথা ভাবে না, টাকা অনেকের অনেক হয়েছে এবং বয়েস হলে মানুষের যা দরকার সুশ্রীমতো নাবালিকার মুখ, ঠিক নাবালিকা বলা যাবে না, বালিকা অথবা সাবালিকা হয়ে উঠছে, অর্থাৎ মনোরম কাচের জারে পাখির রোস্টের মতো মাংসের দরকার এইসব পৃষ্ঠপোষকদের—তাঁরা না থাকলে এই ধনধান্যে পুষ্পে ভরা আমাদের এই বসুন্ধরা গুপ্তসাবের থাকত না। এখন খুকু, একটা বাচ্চা মেয়ে—যে একমাত্র গুপ্তসাবের উত্তরাধিকার সূত্রে এই বৈভবের সব কিছু—তাঁর এমন নেংরামতো স্বভাবে খুবই আঁৎকে উঠেছেন তিনি।

মাঝে মাঝে গুপ্তসাব বিচলিত বোধ করেন। করুণার মৃত্যুর পর খুকু যেন আরো বেশি অসহিষ্ণু হয়ে উঠছে। একে ঠিক অসহিষ্ণু বলা যাবে কি না তিনি বুঝতে পারছেন না, কারণ এই খুকু যার আর আট বছর না হতেই সুন্দর মতো এক যুবতী হয়ে উঠবে। স্ত্রী তার ক্রমে কেমন ক্ষীণকায় হয়ে গেল। অবিশ্বাস আর সন্দেহ ওকে দীর্ঘদিন কুঁড়ে কুঁড়ে খেয়েছে। তারপর করুণা, দুঃখী মেয়ের মতো সেই যে নিজের মহলায় আটকে গেল আর বের হল না। এসব ভাবলে গুপ্তসাব মেয়েকে বেশি জোরে ধমক দিতে পারেন না।

রহমান খুঁজছিল বেড়ালটাকে। সে নুয়ে আলমারির নিচ থেকে ওটাকে আনার চেষ্টা করছে। একটুকুর জন্য নাগাল পাচ্ছে না। ঠিক দেয়াল ঘেঁষে ওটা চুপচাপ বসে রয়েছে। নড়ছে না। খোঁচা মারতে পারলে ওটা ঠিক লাফিয়ে বের হয়ে আসত। বেড়ালটার ভয়ে গুপ্তসাব টেবিল থেকে নামছেন না। মাথার ওপরে ঝালর বাতি। একহাত মতো উঁচু হয়ে গেলেই তিনি বাতিটার সমান হয়ে যেতে পারতেন।

খুকু এক পা নড়ছে না। সে সোজা দাঁড়িয়ে আছে। এবং ভীষণ জেদী মেয়ে। মেয়েটার কথা ভাবলে, গুপ্তসাব কিছুটা আবেগ বোধ করেন। মা নেই মেয়েটার। করুণা তার স্ত্রী, এটা তাকে যত না দুঃখ দেয়, করুণা এই মেয়েটার মা ছিল, মা না থাকলে কিছু থাকে না, গুপ্তসাব তখন আর রাগ করে থাকতে পারেন না। বেড়ালটা তার শরীর বেয়ে ক্রীমির মতো উঠেছিল ভাবলেই শরীর ভীষণ শির শির করতে থাকে। এবং যতক্ষণ মিউ মিউ করবে, ততক্ষণ তার স্বস্তি নেই। শরীরে যে এমন শির শির অনুভূতি, একটা ভয় পাইয়ে দিতে পারে তিনি জানতেন না। এবং কিছুদিন আগে একটা কুকুরছানা কি করে খুকু তুলে এনেছিল। বাড়িতে এমন দুটো বড় জাতের এ্যালসে-সিয়ান রয়েছে, এবং তাদের খাবার থেকে বিছানা, সবই একজন মানুষের পরিচর্যায় চলে, এত যত্ন আত্তি যখন কুকুরের তখন কিনা খুকু কোথাকার একটা নেড়ি কুকুরের বাচ্চা লুকিয়ে তুলে এনেছিল। কি ভাবে, কাকে দিয়ে। অবশ্য আউট-হাউসে দারোয়ান করণ সিং আছে। সে তার পরিবার নিয়ে থাকে। করণ সিং-এর ছেলেটা খুকুর বয়সী। একদিন তিনি দেখেছিলেন, করণ সিং-এর ছেলেটা পাঁচিলের ওপর উঠে প্যাণ্ট খুলে কি দেখছে খুকু নিচ থেকে উঁকি দিয়ে রয়েছে, এবং এ-সব মনে হলেই মাথাটা গুপ্তসাবের গরম হয়ে যায়। তিনি ইচ্ছে করলেই করণ সিংকে ডাকাতে পারেন, বলতে পারেন, তোমার বিবি বেটাকো দেশ মে ভেজো। কিন্তু এমন বিশ্বস্ত দারোয়ান, সব কিছু

দর্পনের মতো পরিষ্কার যখন, ইচ্ছে করলেই তাড়ানো যায় না। শুধু করণ সিংকে ডেকে বলে দিলেন, তুমকো লেড়কা পাঁচিলকা ওপর মে কিঁও উঠতা? এ আচ্ছা নেই। তারপর ওপরে উঠে গেছিলেন। সিড়ি ভেঙ্গে একেবারে খুকু যে ঘরটায় থাকে সেখানে।

গীতাকে বলেছিলেন. কোথায় থাকো! তুমি দেখেছ।

গীতা মুচকি হেসেছিল।

তিনিও হাসতে পারতেন। অহংকার করার মত শরীরে এখন তার কিছু নেই। কারণ গীতা গুপ্তসাবের প্রথমদিকের রক্ষিতা। তখন গীতার বয়স কম। এবং গীতার মুখশ্রী ভারি সুন্দর ছিল। চোখ টানা, এখনও গীতা সেজে এলে গুপ্তসাব খুব একটা অহংকার নিয়ে বসে থাকতে পারেন না। আর এই গীতা যখন মুচকি হেসেছিল, তিনি তখন একটা কথা না বলে চুপচাপ হয়তো খুকুর মহল থেকে বের হয়ে যেতেন, কিন্তু পাশে এসে গীতাই প্রথম ওকে হকচকিয়ে দিয়েছিল, বলেছিল, খুকু শুনতে পাবে!

— খুকু ঘুমোয়নি!

—না।

—কি করছে।

—ভুটিয়ার সঙ্গে গল্প করছে।

—ভুটিয়া কে আবার!

—কারণ সিং-এর ছেলে!

—ওটাকে তুমি ভেতরে ঢুকতে দিলে।

—কি করব বলুন। কিছুতেই না নিয়ে আসবে না। খাবে না, ঘুমোবে না! আমি কি করব বলুন।

—ওটাকে তোমরা এ-ভাবে ভেতরে ঢুকতে দিলে আমি থাকব কোথায়?

গীতা বুঝতে পারল, গুপ্তসাব মেয়েটার কাছে ভীষণ অসহায়। সে বলল, এক্ষুনি তাড়িয়ে দিচ্ছি।

—ওদের দেশে চলে যেতে বলি!

– কি হবে!

—ভুটিয়ার সঙ্গে অন্ততঃ বন্ধুত্ব থেকে বাঁচা যাবে। ঠাট্টা এবং রসিকতা দুই তিনি উপহাসের ভঙ্গিতে বলতে পারেন। গলার স্বরে এটা ধরতে পেরে গীতা বলল, একটা ভুটিয়া গেলে আর একটা আসবে।

—চোপ! কেমন চিৎকার করে উঠেছিলেন গুপ্তসাব।

—আপনি রেগে যাচ্ছেন। বরং থাক। ঘরের ছেলে ঘরে আছে। ওরাতো এ-সবের কিছু বোঝে না। একটা কৌতুহল মাত্র। এ-বয়সে আমাদেরও ছিল।

গুপ্তসাব আর একটা কথাও বলতে পারেননি।

এবং এখন গুপ্তসাব বুঝতে পারছেন, ঐ ভুটিয়ার কাণ্ড। সে ঠিক এটা কোথাও থেকে ধরে এনে খুকুদিদিমণিকে উপহার দিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে একটা ভয়ংকর ক্রোধ মাথা চাড়া দিয়ে উঠলে তিনি ডাকলেন, রহমান!

—পেয়েছি হুজুর!

—কোথায়?

—এই যে। বলে সে কান ধরে বেড়ালছানাটাকে তুলে ধরল।

—করণ সিংকে বোলাও।

রহমান তক্ষুনি ছেড়ে দিল বেড়ালছানাটাকে। সে করণ সিংকে ডাকতে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে গেল।

আর তক্ষুনি মেয়েটা ছুটে গেল বেড়ালছানাটাকে ধরতে।

গুপ্তসাব চিৎকার করে উঠলেন, খুকু!

খুকু কথা শুনল না। সে ওটাকে পাঁজাকোলে নিয়ে একেবারে ছুটতে থাকল এবং লম্বা বারান্দা পার হয়ে ছুটছে। গীতা সঙ্গে সঙ্গে যাবে ভাবছে। কিন্তু, মেয়েটা এত দ্রুত দৌড়াতে শিখল কি করে! সুন্দর মসৃণ ওর পায়ের গড়ন। খুব কম বয়সে ভীষণ লম্বা হয়ে যাচ্ছে। তাই সিল্কের ফ্রক, ওপরে ফারের দামী কোট, এবং কখনও কখনও

মেয়েটা ঘুমিয়ে থাকলে একেবারে বুকে জড়িয়ে থাকতে ইচ্ছে করে। গীতা কেমন লোভে পড়ে যায়। এই মেয়ে যখন বড় হবে, গুপ্তসাব তুমি বুঝতে পারছ কি হবে!

গুপ্তসাব ভেবেছিলেন লাফ দিয়ে নামবেন! গীতাকে কিছু বলবেন, কিন্তু মেয়ের জন্য ভাবনা তাকে কেমন কিছুক্ষণ মুহ্যমান করে রাখলো। গীতাকে তিনি বললেন, দাঁড়িয়ে তুমি কি দেখছো!

গীতা তাড়াতাড়ি চোখের ওপর থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল। সে যেতে যেতে নিমেষে দেখল, চোখের উপর থেকে মেয়েটা অদৃশ্য হয়ে গেছে। সে এখন কি যে করে! যদিও গুপ্তসাবকে মাঝে মাঝে সে প্রলোভনে ফেলে দিতে পারে কিন্তু এখন নতুন নতুন মডেল আনাগোনা করছে, দেখলে মনে হবে, ওঁরা অফিসের কাজ কর্ম করে, পার্কষ্ট্রীটের বাড়িতে ওদের অনেক কাজ, কিন্তু গীতা বুঝতে পারে—কোনটা কোন দেবতার। এবং যখন নিজের প্রতিপত্তি হ্রাস পাচ্ছে বুঝতে পারে তখনই সামান্য ভীত দেখায় তাকে। সে আর তখন গুপ্তসাবের মুখের উপর কথা বলতে সাহস পায় না।

সে ডাকল, খুকুদিদিমণি তুমি কোথায়!

না, কোন জবাব নেই। করিডোর পার হয়ে গেলে দোতলার সিঁড়ি। এবং সিঁড়ি ধরে উঠে গেলে, দুদিকে দুটো লম্বা বারান্দা। বারান্দার দেয়ালে সব বড় বড় ছবি। ছাদে বাতির ঝালর। সে সিঁড়ির ওপরে উঠে আবার ডাকল, খুকুদিদিমণি।

সাড়া শব্দ নেই। কোথায় যে পালিয়ে আছে। এখন বাজে নটা। নটার সময় খুকুদিদিমণির ফলের রস খাবার কথা। ছুটির দিন বলে স্কুলে যাবার কথা নেই। বেড়ালের লোম ভীষণ অপকারী। এবং গুপ্ত-সাবের ভয়ে বোধ হয় এখন পার্লারে মুখগোমড়া করে বসে রয়েছেন। সুতরাং গীতা বারান্দা পার হয়ে আউট-হাউসের দিকে এসে গেল। দোতলার রেলিঙে দাঁড়ালে আউট-হাউস দেখা যায়! পেছনের দিকে বেশ কিছু লিচু গাছের ভেতরে একটা ছোট বাড়ি। ভুটিয়াকে সে

দেখবে আশা করেছিল। না, নেই।

ছাদে একবার উঠে দেখলে হয়। সে আবার সিঁড়ি ভাঙছে। ওর ভীষণ হাঁপ ধরেছিল। চিলে কোঠার কাছে এসে সে দম নিতেই দেখল, খুব জড়সড় এবং ভীত মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে খুকুদিদিমণি। সে বুঝতে পারছে বেড়ালছানাটা ওর ফারের কোটের নিচে। সামান্য গরমে বেশ ওটা চুপচাপ আছে। মনেই হয় না, একটা বেড়ালছানা নিয়ে খুকুদিদিমণি এখন দাঁড়িয়ে আছে।

সে বলল, এস খুকুদিদিমণি।

খুকুদিদিমণি বলল, না, আমি যাব না।

—খাবে।

—খাব না।

—ওটা তোমার কাছেই থাকবে।

খুকুদিদিমণি তখন আর কিছু বলল না।

এবং গীতা জানে এ-বাদে এখন আর এমন আদুরে মেয়েকে কিছুতেই বশ মানানো যাবে না। অন্তত খুকুদিদিমণিকে খাওয়াতে হলে, বেড়ালছানাটাকে এখন খেতে দিতে হবে। এমন একটা ছোট্ট বেড়ালছানা কি যে উৎপাতে ফেলে দিল সমস্ত সংসারটাকে।

বাড়িটা যেহেতু এক পুরুষের, অর্থাৎ গুপ্তসাব নিজের বুদ্ধি এবং কৌশল, অর্থাৎ গুপ্তসাব, ঠিক সংসারে যে ভাবে খাপ খাইয়ে চললে, বেশ দুপয়সা করে ফেলা যায়, তার একটা কৌশল নির্মাণের ইতিহাস জেনে ফেলেছিলেন। করুণার সুন্দর মুখ, টানা চোখ, এবং করুণাই প্রথম দিকে সব ছিল তার—সে তাকে নিয়ে দত্তসাহেবের কাছে না গেলে, সোনার খনির খোঁজ পেতেন না।

দত্তসাহেব ছিল করুণার এক বান্ধবীর আত্মীয়। সে-সব অবশ্য দীর্ঘ পনেরো বছর আগের কথা। বেড়ালছানার গল্প বলতে গেলে, সে-সব কথাবার্তার দাম থাকে না। তবু এই বাড়ির ইঠকাঠে একজন রূপবতী মেয়ের দীর্ঘনিঃশ্বাস রয়েছে, এবং যার মেয়ে খুকু-

দিদিমণি ওরফে রূপা, আরও ভাল করে বললে, কল্যাণী গুপ্ত, গুপ্ত-সাবের একমাত্র উত্তরাধীকার সূত্রে প্রাপ্য সম্পত্তির সব কিছু সে এখন ছোট্ট এক বেড়ালছানার মায়াজালে পড়ে পৃথিবীর সবকিছু মূল্যহীন ভাবছে।

গীতা বলল, হাত ধুয়ে নাও।

হাত ধুতে গেলেই বেড়ালছানাটা টপ করে পড়ে যাবে। ওটা এখন ওর কোটের নিচে ঢুকে দু থাবায় ঝুলে আছে। নোখ বেশ বড় বলে, একেবারে যেন সে বাঘের বাচ্চার মতো দাঁত এবং থাবার সাহায্যে ঝুলে আছে। না ধরে রাখলেও আসে যায় না। তবু বোধ হয় কষ্ট হবে ভেবে সে কিছুতেই হাত ধুতে চাইছে না। মনে হচ্ছিল, হাত তুলে আনলেই টপ করে পড়ে যাবে, তারপর ছুটে পালিয়ে যাবে—পালিয়ে গেলে সে আর সারাদিন কিছু খেতে পারবে না। এবং একবার এভাবে একটা নেড়ি কুকুরের বাচ্চা ভুটিয়া তাকে জোগাড় করে দিয়েছিল। ভুটিয়া বেশ ভাল, ভুটিয়া একমাত্র এত বড় বাড়িতে তার নিজের বলতে সব। ভুটিয়াকে সে কখনও দেখেনি, তার কথা না শুনে কাজ করেছে।

প্যানট্রিতে মকবুল মুরগি ছাড়াচ্ছে তখন। মুরগির রোষ্ট খেতে গুপ্তসাব খুব পছন্দ করেন। একটা বড় সাদা চিনেমাটির বাসনে দুটো বড বড় ছোলা মুরগি দু'তিন মাসের বাচ্চার মতো জড়াজড়ি করে পড়ে আছে। আয়িমা একবার উঁকি দিয়ে গেছে। গরম জলের ট্যাপ সকাল থেকে খারাপ। মিস্ত্রি না এলে ঠিক হবে না। সকাল থেকে সবাই প্যানট্রিতে জুলুম চালাচ্ছে। আয়িমা এসেছে সস্‌পেনে গরম জল নেবে বলে। সে দু'মগ গরম জল দিলে আয়িমা বলল, আজ কি রাতে চিলি চিকেন হচ্ছে।

মকবুল বলল, জি আয়িমা।

গীতা বলল, আমার জন্য সামান্য রাখবে।

—জি আয়িমা।

—আর শোনো, বেবির জন্য গ্রীণপিজ সেদ্ধ, ডিম সেদ্ধ, আলু সেদ্ধ গাজর সেদ্ধ, এক প্লেট বিরিয়ানি, এক কাপ হরলিকস।

—জি আয়িমা।

মকবুল জানে, একটু বাদেই অর্থাৎ ঠিক এগারোটায় এসব যাবে বেবি দিদিমণির জন্য। মকবুল খুকুদিদিমণি ডাকতে ভীষণ তোতলায় বলে যে বিদিদিমণি বলতে পছন্দ করে। আসলে এই সব খাবার এক বি ন্দু বেবিদিদিমণি খাবে না, সবটা খাবে আয়িমা। নিজের পছন্দমতো সব খাবার। ডাক্তারবাবু একটা ম্যান্যু করে দিয়ে গেছে। মাঝখানে বেবি- দিদিমণির শরীরে মাংস বেশি লেগে যাচ্ছিল, হুজুর ভয় পেয়ে গেলেন, কমাও কমাও, মাংস কমাও, সবই সেদ্ধ টেদ্ধ আর কিছু বরাতে জুটত না বেবিদিদিমণির। তখন মকবুল ছিল ওর সব। সেই পালিয়ে পালিয়ে সব দামী খাবার, যেমন গুপ্তসাব যা যা খেতে পছন্দ করেন, ওঠমিলন পরিজ চুরি করে খাওয়াতো বেবিদিদিমণিকে। সেই বেবিদিদিমণি সকাল থেকেই একটা বেড়ালের পাল্লায় পড়ে গেছে। খুব নাস্তানাবুদ আয়িমা। ওর খুব আনন্দ হচ্ছিল। সে এক ফাঁকে, জাহাজে সেকেণ্ড কুকের কাজ করেছে বলে ইংলিশ ম্যান্যু একেবারে সব জানা। সে কিছুদিন জাহাজ ছেড়ে ছিল যখন, তখন চাইনিজ রেঁস্তরাতে রেঁধে হাত পাকিয়েছে। গুপ্তসাবের এ দুটো খানাই প্রিয়। না আরও প্রিয় খাবার আছে। শনিবার শনিবার তিনি দুপুরে ভাত খান। শনিবার অফিসে যান না। রোববার ছুটির দিন। মকবুলের ম্যান্যু এত লম্বা হয়ে যায় যে মাঝে মাঝে মনে হয় ম্যান্যুর তালিকাটা তার কদিনের কাজে লেগে যেতে পারে।

শনিবার ভাত মাছ, যেমন ইলিশ মাছ সরষে দিয়ে, অথবা মুগের ডাল মূলো দিয়ে, এবং বড়ি দিয়ে পলতাপাতার শুকতোনি, কখনও পাবদা মাছের ঝাল বেগুন দিয়ে, কাঁচা তেঁতুলে মুসুরি ডালের অম্বল। জলপাইর দিনে জলপাই দিয়ে। এবং ঐ দিনটিতেই মকবুল কেবল বুঝতে পারে, সাহেবের দ্যাশ আছিল ঢাকা জিলায়। রান্না থেকে

আরম্ভ করে, খাবার পরিবেশন সব অন্যরকমের। সেদিন তার ছুটি। আয়িমা সকাল থেকে নিরামিষ ঘরে এইসব রান্না যখন করেন তখন একেবারে আয়িমা খাঁটি বামুনের মেয়ে। মকবুলের তখন নিয়মই নেই, ওদিকে যায়! একবার সে কি একটা কা' গিয়ে পড়েছিল করি-ডোরে, প্রায় খুনতি নিয়ে তেড়ে আসার মতো স্বভাব আয়িমার। সে দৌড়ে কোনরকমে প্রাণ বাঁচিয়েছিল। এবং সেদিন খেতে দেরি হয়ে গেলে, গুপ্তসাব থালি গায়ে, পৈতা লম্বা করে ঝুলিয়ে একেবারে খাঁটি বামুনের মতো ধুতি পরে ওপরে উঠে দেখেছিলেন, মাত্র আসন পাতা হচ্ছে। আয়িমা এক প্রস্ত নালিশ জানিয়েছিলেন। মকবুল ওকে ছুঁয়ে দেওয়ায় দেরি। কারণ সব ফের ধুয়ে পাকলে নিতে হয়েছে। ওতেই দেরি হয়ে গেল।

আর মকবুল ভেবেছিল, এই রে গেল চাকরিটা।

চাকরিটা অবশ্য মকবুলের শেষ পর্যন্ত যায়নি। বোধ হয় আয়িমাই শেষ পর্যন্ত বিপদ থেকে তাকে রক্ষা করেছে। আয়িমা জানত, মকবুল চলে গেলে আর একজন মেহবুব আসবে। ও এলে খুব একটা ভাল কাজ করবে ঠিক কি! তা ছাড়া এতদিন একসঙ্গে থেকে থেকে একটা জান পহচানের ব্যাপার আছে, মকবুল অত সহজে চলে গেলেই হল, যেতে দিচ্ছে কে! এমন খাবার কে আর আয়িমাকে সাপ্লাই করবে। এবং মকবুল নিজে বুঝতে পারে সে বেশ দুষ্ট প্রকৃতির লোক। সে আয়িমার প্রথম দিকের রোয়াবের দিনগুলো দেখেছে। তখনই মনে মনে ভীষণ বাসনা ছিল, দুবলা করে দিতে হবে। এবং খাইয়ে খাইয়ে বেশ দুবলা করে ফেলেছে, একবারও আয়িমা টের পেল না। খেয়ে খেয়ে যত মুটিয়ে যাচ্ছে, তত গুপ্তসাবের নজর উবে যাচ্ছে বুঝতে পারছে না আয়িমা। কাজ করতে এসে হাঁপালে সে খুব ভেতরে ভেতরে মজা পায় আজকাল। তারপর গরম মাংস থেকে যখন ফুর ফুর করে গন্ধ উঠতে থাকে—যেন মকবুল তখন ইচ্ছে করেই হাতা দিয়ে বেশ জোরে জোরে নাড়ে, এবং নাড়লেই ভুর ভুর গন্ধটা নাকে গিয়ে

ধাক্কা মারলে আয়িমা কাত। একটু দেখিতো, মকবুল কেমন রাধলে দেখি।

মকবুল বেশ দু হাতা গরম মাংসের চেয়ে বেশি আনলে একটু ভাত খান না, দুটো আরও ভাত দেব আয়িমা, এভাবে খাইয়ে খাইয়ে ঠিক পাকে প্রকারে নিজের অভিসন্ধি অনুযায়ী কাজটুকু সেরে ফেলছে কেবল এখন শুধু শনিবার দিন, একটা দিন মাত্র, ঢাকার গুপ্তসাব জলপাই দিয়ে ডালের অম্বল এবং ভাত মেখে খেতে খেতে মা বাবা এবং দুর্দিনে ওর মাবাবা কত কষ্ট করেছে, অথবা মা কেমন করে লাউ-পাতা দিয়ে বড়ি দিয়ে শুকতোনি রাঁধত, অথবা কলাই শাক এবং কখনও কখনও সরষে ফুলের বড়া, বক ফুলের বড়া—এসব তো আজ-কাল উঠেই গেছে, একেবারে ভুরি ভোজন করে, আয়িমার ওপাশের কামরায় বাঙ্গালী গুপ্তসাব পুরনো পল্টনের বাসিন্দা হয়ে যান। মকবুল তখন কেবল খুক খুক করে কাশে

এত কথা মনে হত না মকবুলের। আজ খুব আয়িমা জব্দ হয়েছে। সকাল থেকে বেবিদিদিমণি আয়িমাকে দৌড় ঝাপ করিয়েছে। এবং আয়িমা যখন গরম পানি নিতে এসে ওর দিকে তাকিয়েছিল, তখন মনে হয়েছিল, আয়িমার অবশিষ্ট আর কিছু নেই। শনিবারের ভাত শাক গুপ্তসাব হয়তো আর খাবে না। তা হলে আয়িমার সব গেল। ওর আয়িমার জন্য কেমন কষ্ট হচ্ছিল এসব ভেবে।

তখন বেড়ালটা মিউ মিউ করে ডাকছে। মকবুল হোসেনের মনে হল বেড়ালটা এত বড় বাড়িতে ঢুকে ঘাবড়ে গেছে। এবং মকবুল হোসেন জানে বেড়ালটা এখন বেবিদিদিমণির খাটে, সামনে বেবিদিদি-মণির বড় আয়না। এবং লেপের নিচে বেবিদিদিমণি আর বেড়ালটা। বেবিদিদিমণি চোখের ওপর কত কম বয়সে বেশি বড় হয়ে গেল। রেশমের মতো চুলে বেবিদিদিমণির কি যে সুন্দর গন্ধ। আর কম্বল অথবা দামী লেপের নিচে বেবিদিদিমণি একদিন, দুদিন, ব্যাস, তারপরই যেই বেড়ালটা খেয়ে খেয়ে মোটা হয়ে যাবে, বেবিদিদিমণির

সব আদর উবে যাবে। ভুটিয়াকে বলবে, এই ফেলে দেতো ওটাকে। বেবিদিদিমণি আর ভুটিয়া মিলে তখন একটা বস্তা যোগাড় করবে। বেড়ালটাকে খাবারের লোভ দেখিয়ে পুরবে ভেতরে। তারপর দোতালায় রেলিঙে দাঁড়িয়ে দেখতে পাবে বেবিদিদিমণি, ভুটিয়া গাছের নিচ দিয়ে চলে যাচ্ছে। ওর কাঁধে ঝোলানো একটা বস্তায় সেই বেড়ালটা। বেড়ালটা তখন আর মিউ মিউ করে কাঁদতে পর্যন্ত পারছে না।

তখনই ছায়া ছায়া অন্ধকারে দাঁড়ালে বাড়িটাকে মকবুলের ভুতুরে মনে হয়। তখন কেউ বাড়িতে থাকে না। একেবারে সে একা। না নিচে থাকে রমেনবাবু, ওটা একটা মানুষ কিনা বোঝাই যায় না। মুখ কালো করে কেবল বসে থাকে। এবং গুপ্তসাব ডাকলেই মুখ ব্যাদান করে দেয়। হাসে এই হাসিটুকু কম পড়ে যাবে ওই ভেবেই হয়তো রমেনবাবু কারো সঙ্গে কথা বলার সময় হাসে না। আর বেবিদিদিমণি তখন দূরের মাঠে বাপের সঙ্গে গলফ্ খেলতে যায়। আয়িমা ওদের বল কুড়িয়ে দেয়। সংসারে তখনও সেই ঝোলা কাঁধে বেড়াল মাথায় ভুটিয়া হাঁটছে। মনেই হয় না, এমন একটা ছবির মতো বাড়িতে এভাবে অনেক দুঃখ আর পাপ, যাকে ওদের ভাষায় বলে গুনাহ্ ক্রমে জমা হচ্ছে। মকবুল তখন ফেজ টুপি মাথায় দিয়ে নামাজ পড়তে বসে। আগামীকাল মাইনের দিন। বিবিকে টাকা পাঠাতে হবে।

মকবুল হোসেনের তখন মনে হয়, সব বড় বড় বাড়ির ভেতরেই এভাবে একটা শয়তানের বাসা আছে। বাইরে থেকে যতটা ছিমছাম, ভেতরের খিলানে খিলানে ততটা পাপ। যত আলগা খিলান, তত চাকচিক্য। তার বড় বড় দেয়ালে সব খিদমতগারদের ছবি। তার এবার দু'হাটু মুড়ে চোখ বুজতে ইচ্ছে হয় শুধু। সে বুঝতে পারে শয়তানের আবাস ছাড়িয়ে মানুষ বেশিদূর যেতে পারে না।

দুই

এভাবে শয়তানের আবাসে খুকু ক্রমে বড় হয়ে যাচ্ছিল।

এভাবে গুপ্ত নিবাসের খুকু ক্রমে কল্যাণী হয়ে গেল। কেউ এখন খুকু বলে ডাকলে তার ভীষণ রাগ হয়। তবু বাবা যখন ওপরে উঠে আসবার সময় খুকু বলে ডাকেন তখন মনে হয় এ-বাড়ির ভেতর যে একটা শৈশব ছিল, রুগ্ন বেড়াল ছানা অথবা কুকুর ছানার প্রতি তার যে ভীষণ মমতা বোধ ছিল, কে যেন মনে করিয়ে দেয়। মা মরে যাবার পর থেকে একমাত্র বাবার এই সুন্দর ডাক এবং তাতে সাড়া দেওয়ার ভেতর বেশ একটা আনন্দ আছে। আর কেউ ডাকলেই যেমন বাবুর্চি মকবুল একদিন ডেকেছিল বেবিদিদিমণি তোমার কে এসেছে গ্যাখো। তখনই কল্যাণী রাগ করে বলেছিল, মকবুল আমাকে আর বেবিদিদিমণি বলে ডাকবে না। আমার ক্লাশের বন্ধুরা শুনে ভীষণ হাসাহাসি করে। মকবুল বলেছিল, আচ্ছা দিদিমণি কি বলে ডাকব?

—আমাকে তুমি মেমসাব ডাকতে পার না।

মকবুল বলেছিল জী মেমসাব।

গীতা মাসি বলেছিল, তোমার এখনও মেমসাব হবার মতো বয়েস হয়নি কল্যাণী।

কল্যাণী বলেছিল, হয়নি তো হয়নি। ডাকতে বলেছি ডাকবে।

গীতামাসির সে সাহসও নেই, সে প্রতিপত্তিও নেই। মকবুল প্যানট্রি থেকে শুনতে পেয়েছিল। এবং ভীষণ মজা লাগে তার তখন। বেশ বলেছে মেমসাব। মুকবলের সামান্য বিরূপতা আসে গীতামাসির প্রতি। বাড়িটা:কে শয়তানের আবাস অথবা সেই যে বলা যায় বেবিদিদিমণির মা, সংসারে যে ছিল আসল মেমসাব, যাকে নাকের জলে চোখের জলে এক করেছিল—এবং একটা গোপন অশ্লীলতা ছিল

গীতা মাসির শরীরে, গীতা মাসি কি করে যে হাত করে ফেলল গুপ্ত-সাবকে সে এখনও সঠিক বুঝতে পারে না। মেমসাব তারপর থেকে দিন দিন শুকিয়ে গেল। মেমসাব মরে গেল। এবং নতুন মেমসাব আবার এ-বাড়িতে যখন গজিয়ে উঠেছে তখন তাকে মেনে নেওয়াই ভাল। সে মুরগিব রোস্ট লোহার উনুনে ঠেলে দিয়ে দরজা বন্ধ করে দিচ্ছিল তখন। দরজাটা আস্তে আস্তে বন্ধ করেছে এবং সন্তর্পণে আর কি কি কথা কাটাকাটি হয় শোনার জন্য বেশ আড়ালে দাঁড়িয়ে ছিল। আর বোধ হয় বেবিদিদিমণি টের পেয়ে যাচ্ছে—সংসারে একজন আয়া দিন দিন কিভাবে গীতা মাসি হয়ে গেছিল। বেবিদিদিমণি যখন মুখের ওপর জবাব দিতে শিখেছে তখন সে আর অন্য কোথাও কোনো বড় হোটেলে কাজ নিয়ে চলে যাবে না।

কল্যাণীর পড়ার ঘরটা একেবারে পশ্চিমের দোতালায়। এবং ঘরটা ভীষণ নিরিবিলি। আর চার পাশে অজস্র গোলাপের সমারোহ নিয়ে যখন বাড়িটা এক অতিশয় বৈভবের ভেতর আছে তখন কল্যাণী তার পড়ার ঘরে সুন্দর কারুকার্যময় টেবিলে ঝুঁকে দেখতে পায় নিজের প্রতিবিম্ব-আয়নায়। সে দেখতে পায় ভারি লম্বা শরীর তার। তার শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ভীষণ লাবণ্যময়। আর সে জামদানি শাড়ি পরতে পছন্দ করে। ওর শাড়িতে তখন নানারকম প্রিণ্ট থাকে। এবং এমন হাল্কা যে মনেই হয় না সে শাড়ি পরে আছে। সে আবার বাইরে বের হবার সময় দামী অথচ সাদামাটা শাড়ি পরতে পছন্দ করে থাকে। এবং কোনো অহমিকা নেই মুখে। ক্লাশের মেয়েরা তাকে ভীষণ পছন্দ করে সে-জন্য। ছেলেদের কাছে সে ভারি প্রিয। যেমন সে মাঝে মাঝে গোপাল বলে একটা ছেলেকে লিফট দেয়। গোপাল নামটা সাদামাটা। গোপাল খুব ভীরু স্বভাবের। আর গোপাল খুব লাজুক। গোপালের মা আর গোপাল। গোপাল গরীব এবং দুঃখী। অদ্ভুত ব্যাপার এটা ঠেকত সবার কাছে।

গোপালের শ্রী আছে মুখে, গোপাল উঁচু লম্বামত ছেলে। পড়াশোনায় গোপাল খুব একটা ভালো ছেলে নয়। কল্যাণী তবু সবার চেয়ে গোপালকে পছন্দ করে থাকে বলে—এটা কল্যাণীর ভারি আশ্চর্য স্বভাব মনে হয়েছে। কখনও কখনও বাড়ির সবাই অবাক। মকবুল দেখেছে গোপালকে নিয়ে হাজির মেমসাব। ভাল খাবার যা কিছু মুখোমুখী বসে খেয়েছে। গীতামাসি তখন গজগজ করেছে অস্ফ স্বরে। গুপ্তনিবাসে এমন অনাসৃষ্টি ব্যাপার কে কখন দেখেছে বললে মকবুল বলত, আমি দেখেছি।

—তুমি আবার কবে দেখলে!

—বারে মনে নেই, সেই যে একবার একটা নোংরা বিড়াল ছানা নিয়ে বাড়িতে কি অশান্তি!

—আমার আবার অশান্তির কি আছে।

—সেই যে গীতা মাসি মনে নেই করণ সিং-এর ছেলে কাল্লু না কি নাম ছিল, মনে নেই একটা লেড়ি কুকুরের বাচ্চা তুলে এনেছিল পাঁচিলের ওপাশ থেকে, বেবিদিদিমণি তুলে আনতে বলেছিল কাল্লুকে—আমার মনে আছে সব।

গীতামাসি ভীষণ চটে যেত। এবং যেহেতু খেয়ে খেয়ে চর্বি জমে যাচ্ছে, কারণ মকবুল সব সুস্বাদু খাবার গীতামাসিকে গোপনে যোগান দিয়ে থাকে এবং এই সূত্র ধরে মকবুলের কাছে খুব বড় একটা রোয়াব নিতে পারে না গীতামাসি। যত স্থূল হয়ে যাচ্ছে শরীর তত গুপ্তসাবের নজর পড়ে যাচ্ছে। এবং আর কিছুদিন গেলে মকবুল জানে গীতামাসি গুপ্তসাবের কাছে ভারি অকেজো হয়ে যাবে। এবং সে ভেবেছিল সেদিনই এ-বাড়ি থেকে তার ছুটি। তার যেন একটা প্রতিশোধের স্পৃহা ক্রমে জেগে উঠেছে।

আর তখনই হাঁক, ঘড়ির কাঁটায় কাঁটায় কাজ, মেমসাব স্নানে যাচ্ছেন। এবং এ-সময়টা বাড়িতে টু শব্দ হলে রক্ষে থাকবে না। বাথরুম থেকে চেঁচাবে মেমসাব, কি হচ্ছে, তোমরা কেউ আস্তে হাঁটতে

পার না।

মকবুল বুঝতে পারে না চানের সময় কোথায় কি একটা বড় রকমের শব্দ হল ব্যাস! অথবা নিচে রমেনবাবু খাতা নিয়ে বসে থাকেন। সংসারে যার যা দরকার এবং পয়সা গণ্ডা যার যা কিছু লাগবে তিনি সাধারণতঃ দিয়ে থাকেন। লম্বা খাতায় পাই পয়সার হিসেব। আর মুখে চোখে কত সৎ মানুষ এমন একটা ভাব, মকবুলের বেলায় যত তার হিসেব গণ্ডগোল। এখন হবে না, পরে দেখা যাবে— গীতামাসি কিংবা করণ সিং অথবা ড্রাইভার নবীন ভট্টচায তো বোয়াবের মাথায় এসে টাকা পয়সা নিয়ে যায়—সে কেন যে পারে না। দোতালায় থাকে বলে একটু যে মনের দুঃখে কাওয়ালি গাইবে তাও পারে না। একবার চানের ঘরে মেমসাব, সে জোরে কাওয়ালি গেয়েছিল। মেমসাব বের হয়ে বলেছিল, মকবুল আমি আর চানটান করব না। তোমাদের এত করে বলি তোমরা শুনতে পাও না!

এই হয়েছে জ্বালা মকবুলের, সে থাকে ওপর মহলায়—প্রায় মেমসাবের মহলার কাছাকাছি এবং সে যেহেতু বয়সী মানুষ তার প্রতি মেমসাবের কোনো লাজ সরম নেই। যে পোশাকে এসে দাঁড়িয়েছিল মেমসাব, সে যতই ধার্মিক হোক চোখ তুলে তাকাতে পারে নি। মাথা নিচু করে বলেছিল, জি মেমসাব!

সেই থেকে চানের ঘরে যাচ্ছে শুনলেই মকবুল যত কম সম্ভব কথাবার্তা বলে থাকে। বয় রতন সাদা প্যাণ্ট জামা, মাথায় সাদা টুপি পরে তখন পা টিপে টিপে হাঁটে। হাতা খুন্তির যেন কোনো শব্দ না হয় এবং যতক্ষণ চানের ঘরে থাকবেন মেমসাব, মকবুল একেবারে তটস্থ। ওর সাদা দাড়িতে তখন অল্প অল্প ঘাম দেখা দেয়। দু এক ফোঁটা পড়ে গেলে ঝালে ঝোলে তোবা তোবা বলতে থাকে মনে মনে। এত করেও সে দাড়িতে ঘাম কমানোর কোনো দাওয়াই খুঁজে পায় নি। এবং একবার হাত থেকে কাচের জার পড়ে ভেঙে গেলে ওর জ্বর এসে গেছিল। কারণ ভয় ছিল, বুঝি মেমসাব ছুটে

আসছে। রাগ হলে মেমসাবের মাথা ঠিক থাকে না। হয়তো একেবারে নাঙ্গা হয়ে দাঁড়িয়ে যাবে। গায়ে যে আব্রু নেই মনেই থাকবে না। তখন যে তার কি হবে এই ভয়ে তার জ্বর আসার মতো যখন অবস্থা তখন গীতামাসি এসে বলেছিল, আবার ভাঙ্গলে!

—আমি কি করব মাসি? হাত থেকে পড়ে গেলে আমি কি করব?

—তুমি কি করবে দেখাচ্ছি। বদমাসের হাড়। তুমি মকবুল ভীষণ বদজাত। সাহেব আসুক, আজ বলছি। এটা আমি প্রয়াগের মেলা থেকে এনেছিলাম। গুপ্ত সাব বলেছিলেন, কি সুন্দর ভাখো গীতা। তুমি সেটা হারামীর মতো ভেঙ্গে ফেললে। বোধহয় সেদিন গীতামাসি তাকে খেয়েই ফেলত কিন্তু বেবিদিদিমণি খুব ধীর-স্থির পায়ে কাছে এসে দাঁড়িয়েছিল। বলেছিল, তুমি ভেঙ্গেছ?

মকবুল বলেছিল, জি মেমসাব।

—বেশ করেছ। কাচের জিনিস ভাঙ্গবে না তো সোনার জিনিস ভাঙ্গবে। বলে প্রায় ধীর পায়ে চলে যাচ্ছিল। তখন মকবুল উর্দি পরে ঘেমে নেয়ে গেছে। সে একটু এগিয়ে গিয়ে বলল, মেমসাব।

—কিছু বলবে?

—মেমসাব, কিছু হবে না তো?

—কী হবে?

—গুপ্তসাব যদি....

—সে আমি দেখব।

তারপরই মকবুল ট্যারা চোখে চেয়েছিল গীতামাসির দিকে। আর আল্লা এমন খুবসুরৎ মেয়েটিকে দোয়া করুন, এমন সে ইচ্ছে প্রকাশ করেছিল। বেবিদিদিমণিকে কি যে ভাল লাগছে! প্রায় আসমানের তারার মতো। হেঁটে চলে যাচ্ছে। লম্বা মতো পায়ের

কাছাকাছি গাউন, চুল হেয়র-ডু করা, পিঠ একেবারে প্রায় খালি। এমন সব ছবি সে যখন জাহাজে চিফ কুকের কাজ করত, বড় বড় বন্দরের সো-কেসে দেখেছে। এখন এ-বাড়িতে। চোখ টানা টানা, আর ভ্রূ-তে মিশকালো জলের রঙ। যেন ছুঁয়ে দিলেই সব ঝর ঝর করে ঝরে পড়বে।

গীতামাসি ভীষণ অপমানিত বোধ করেছিল। মুখগোমরা করে রেখেছিল অনেকক্ষণ—কিন্তু গীতামাসির যা স্বভাব, ভাল খাবার, এই সুস্বাদু কিছু হলে অপমানবোধ একেবারে থাকে না। খুব আপনজনের মতো বলেছিল, আমি তো বলি না মকবুল। যদি কোনোদিন গুপ্তসাব জিজ্ঞেস করে, গীতা আমাদের সেই প্রিয় কাচের জারটা কোথায়? তখন কি হবে?

মকবুল বলতে পারত, সাবের তো খেয়েদেয়ে আর কাজ নেই। কাচের জার বেশিদিন টেকে না গুপ্তসাব জানেন। এ নিয়ে তিনি কোনো জিজ্ঞাসাবাদ করবেন ভাবতেই মকবুলের সামান্য হাসির উদ্রেক হল।

মকবুল এত সব জানে বলে মেমসাবের চানের সময় কোনো গণ্ডগোল করে না। দুটো-একটা শব্দ কেউ কোথাও জোরে করে ফেললে মকবুল সন্তর্পণে ছুটে যাবে—এই কেরে? কে লাফিয়ে সিঁড়ি ভাঙছিস! আস্তে বাপজান। মেমসাব চানের ঘরে। এবং গীতামাসি ভেবে পায় না মেয়েটার এত সময় কেন দরকার চানের ঘরে। যেন মেয়েটা চানের ঘরে থাকলে বের হতে চায় না। ঘড়িতে সময় হয়ে যায়। ঘড়ির সামনে গীতামাসি দাঁড়িয়ে থাকে—আর কেবল বুক ঢিপ ঢিপ করতে থাকে তখন। সময় মতো কলেজে পৌছে দেওয়া, গাড়ি-বারান্দায় সেই কখন থেকে গাড়ি লেগে থাকে—তবু মেয়ের চান শেষ হয় না। আদরে আদরে একেবারে বারোটা বেজে গেছে।

কল্যাণীর কি যে সুন্দর লাগে চানের এই ঘরটা। যতবার ঢুকে

যায় তত যেন এক মনোরম জগৎ। চারপাশে পাতলা লেসের পর্দা ঝোলানো। সুন্দর কারুকার্য করা আলোর মালা। এবং বাথটবে কাচের মতো জলের ভেতর সোপ-পাউডার মেশালে আশ্চর্য ফেনা। তার ভেতর কল্যাণী শুয়ে থাকে। এবং হাতে পায়ে অথবা জংঘার দু'পাশে মনোরম সব নরম উলের সবুজ অথবা নীল কখনও ফ্লোরো-সেন্ট বাতির মতো হা-করা মুখ। আর সেই হাতির দাঁতের রঙ জংঘার। মোমের মত মসৃণ এবং ত্বকে কি যে লাবণ্য। আয়নায় নিজের মুখ চোখ দেখে সে কখনও গুন-গুন করে গান গায় অথবা নিজের সৌন্দর্যে কেমন এক অভিমানী মুখ। তখন চোখ বুজে থাকে। গোপাল, গোপাল নামটা মনে হয় আশ্চর্য এক নাম অথবা, যে-কোনো দুঃখী যুবক পায়ের কাছে গড় হয়ে আছে, অথবা হেঁটে গেলে সে, পাশ থেকে তার শরীর লেপ্টে থাকতে চায়, এবং মনে হয় সেই জংঘার দু'পাশে সব ইচ্ছারা খেলা করে বেড়াচ্ছে। সে হাত দিয়ে দিয়ে কখনও দেখতে দেখতে তন্ময় হয়ে যায়—এটা এক মনোরম জীবন। এখান থেকে চলে গেলেই তার সব কেমন সাদামাটা। বাড়িতে সব মানুষের ভারি উৎপাত। ওর কোথাও কখনও পান থেকে চুন খসবার নিয়ম নেই। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে ভারি নরম হাতে শরীরের সব জল ধীরে ধীরে মুছবার সময় স্তন উঁচু করে একটু তার ঝুঁকে দেখা—এ সবের ভেতর তার নিমগ্নতা এবং নিজের কাছে নিজেই বড় মহার্ঘ বস্তু। তখন হয়তো দরজায় দাঁড়িয়ে গীতামাসির ভীরু গলা—কল্যাণী কলেজের সময় হয়ে গেছে।

কল্যাণী পাত্তাই দিতে চায় না। সে নিজেও একটা ঘড়ি সেল্ফে রেখে দেয়। কিংবা বাথরুমে যেন বড় গোল টেবিল ঘড়ি সব সময়ই থাকার নিয়ম। ঘড়িটা দামী এবং বিদেশ থেকে আনা। কাঁচের বাতিদানের মতো মনে হয়। ভেতরে একটা পাখি ফুল ঠুকরে খাচ্ছে। সময় হলেই পাখিটা কাঁচের জারে ঘুরে বেড়ায় এবং ঘণ্টা বাজিয়ে

দেয়। তখন কল্যাণী বুঝতে পারে তার যথার্থ সময় হয়ে গেছে। সব ধুয়ে-পাকলে ঘাড়ে এবং বগলে, তারপর স্তনে নরম পাফ বুলিয়ে দিলেই কেমন এক স্নিগ্ধতা—সে তখন একেবারে পরিপাটি হয়ে বের হয়ে আসে। দেখতে পায় সাদা চাদরে সব বড় চিনেমাটির প্লেট, তুপিস পাউরুটি, একটু গ্রীন পিজ, সামান্য স্যালাড, দু' টুকরো মুরগীর ঠ্যাং অথবা রোস্ট বলা যেতে পারে। দুপুরে এই খেয়ে এক কাপ চা। আর কিছু নয়। শরীর সম্পর্কে বড় বেশি চিন্তা কল্যাণীর। সে যত বড় হয়ে যাচ্ছে, তত সে এভাবে নিজেকে সুখী দেখতে ভালবাসছে।

মকবুলের তখন আসার নিয়ম নেই এদিকে। রতন তখন দরজার কাছে কোথাও থাকে। কখন কি ফরমাস তামিল করতে হবে। গীতামাসি জানলার কাছে দাঁড়িয়ে থাকে। আর সে কারো দিকে তখন তাকায় না। ন্যাপকিনে মুখ মুছে, পায়ে শ্লিপার গলিয়ে তর-তর করে সিঁড়ি ভাঙতে থাকে। নিচের তলায় নেমে সে দেখতে পায়, রমেনবাবু দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে। করণ সিং গাড়ির পাশে, তার ড্রাইভার সুজিত বেশ একেবারে উর্দি পরে যেমন থাকার কথা, কোথাও এতটুকু অনিয়ম নেই—আর তখন কেন যে কল্যাণীর ভীষণ হাসি পায়। রমেনবাবুকে সে পৃথিবীতে যতবার দেখেছে, দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ক্রীতদাসের মতো হেসে বড় সুখে আছে এমন মুখ করে রেখেছে। বোধহয় ওর পায়ের শব্দে এ-বাড়ির সবাই টের পেয়ে যায়, মেমসাব নামছে। টের পেয়ে যায় আসছে—একবারে মুখে চোখে শংকা জাগিয়ে, জোর করে একটু হাসা তখন। কল্যাণী সব বুঝতে পারে বলে সব সময় কেমন অহংকারী মুখ। তবু বিনয় চোখে মুখে রাখার জন্য কথাবার্তা ভীষণ মোলায়েম—সহবৎ বলতে যা-কিছু সব যেন সে জেনে ফেলেছে। গীতামাসি তখন পেছনে পেছনে ওর যা দরকার, কলেজের বই, খাতাপত্র সব, নোট নেবার ডায়েরি আরও কত কি, বগলদাবা করে নেমে সুজিতের কাছে দিলে—সুজিত বেশ গুছিয়ে রেখে দেয়—এবং গাড়িটা বের হয়ে গেলেই একেবারে সব আমলারা

সহজেই স্বাভাবিক হয়ে যায়। তখন গোলমাল চেঁচামেচি, কারণ সাব অফিসে, মেমসাব কলেজে, বাড়িটা আবার তখন স্বাভাবিক। রমেনবাবু তখন ইজিচেয়ারে শুয়ে পর্যন্ত পড়তে পারেন। চোখ বুজে একটা সিগারেট খেতে খেতে বেশ আহাম্মক বানিয়ে দু' পয়সা করে নেওয়া যায় যা হোক, টাকার গাছপালা বোধহয় আছে গুপ্তসাবের। যে যার খুশিমতো, দরকার মতো পেরে নাও। গুপ্তসাবের কোনো দৃকপাত নেই। মানুষটার সব অসদাচরণ, চরিত্রহীনতা সহ্য করতে কারও কোনো তখন কষ্ট হয় না।

কল্যাণী কলেজে যাবার সময় দেখতে পায় মানুষে গিজ গিজ করছে ফুটপাথ। এত মানুষ আসে কোথা থেকে! সে মাঝে মাঝে বাইরের বড় শহরে গেছে, অথবা কখনও ভ্রমণে সে কোনো পাহাড়ী শহরে থেকে দেখেছে—এই শহর যতই নোংরা অপরিচ্ছন্ন হোক কেমন একটা মায়া পড়ে গেছে শহরটার জন্য। যদি এই সব মানুষেরা ভাল থাকত। কেন এরা ভাল থাকতে পারে না, কিসের অভাব! এরা কেন বাবার মত নয়, বাবা যেমন বুদ্ধিমান এবং বিচক্ষণ হলেই তো বজ্জাতি বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা—এবং তখনই কল্যাণীর মনে হয় গোপাল ভারি সৎ ছেলে। বিচক্ষণ নয় বলেই সে গোপালকে দিয়ে খুশিমত সব করাতে পারে। এবং এটা একটা স্বভাব হয়তো কল্যাণীর—খুব বিচক্ষণ এবং বুদ্ধিমান লোকদের তার পছন্দ নয়। সে যেতে যেতে গরীব দুঃখী লোকদের দেখলে ভীষণ কষ্ট পায়। ভিখিরি দেখলে সে ভাবে, বড় হলে ওদের জন্য একটা হোটেল করে দেবে। সেখানে ওরা খাবে থাকবে, তাস খেলবে, দরকার হলে হাডুডু। সে যেতে যেতে বলল, বুঝলে সুজিত তোমার কি মনে হয় না এদের জন্য কিছু করা যায়।

সুজিত না তাকিয়ে জবাব দেবে। তাকিয়ে জবাব দিলে ভারি অপমানের, সুতরাং সে বলবে, মেমসাব কি করা যায়?

—এই যে, দ্যাখো কেমন সব নোংরা ফুটপাথ, মানুষজন, এরা এত নোংরা থাকলে, আমরা সবাই নোংরা হয়ে যাব।

—তা ঠিক মেমসাব।

—গোপালকে তোমার কেমন লাগে।

—খুব ভাল মানুষ মেমসাব।

—গোপাল তোমার খুব প্রশংসা করে।

সুজিত নিজের প্রশংসা শুনে একটু দমে গেল। বাবুদের বাড়ির মেয়ে। মর্জি ঠিক বোঝা যায় না। কি আবার তারপর তাকে বলবে, কোনো দরকার না পড়লে বড়-লোকের মেয়েরা প্রশংসা করেনা। তাকে দিয়ে বড়রকমের কোনো কাজ হাসিলের মতলব বোধ হয় আছে। সে বলল, গোপালবাবুকে আজ আবার লিফট দিতে হবে মেমসাব?

—গোপালকে নিয়ে এক জায়গায় যাব। তুমি নিয়ে যাবে।

—জি মেমসাব।

এবং এটুকু করবে বলেই সুজিত বেশ চতুর মানুষ হয়ে যেতে পারে। অনেক সুযোগ-সুবিধা সে পাবে মেমসাবের কাছ থেকে। তার মনটা সহসা খুব খুশীতে ভরে গেল। -কোথায় যাবেন?

—কলেজে যাব না ভাবছি। ওকে আমি তুলে নেব। বলে প্রায় সিটে এলিয়ে পড়ল। বাতাসে আঁচল উড়ছে। হাই উঠছিল। যেন ঘুম পাচ্ছে। আসলে শরীরের ভেতর কি যে থাকে—এবং ভেতরে ভেতরে এক অভিনব জ্বালা অথবা দুঃখ। কোনো মানুষের শরীর তখন ভারি রোমাঞ্চকর। সে গোপালকে নিয়ে একটু এদিক ওদিক ঘুরে কোন থিয়েটারে ঢুকে যাবে। তারপর যদি গোপাল সামান্য সময় একটু সুখ দেয়। সামান্য সুখের কাঙ্গালপনা চোখেমুখে এখন জ্বলজ্বল করছে।

ওরা যখন থিয়েটারহল থেকে বের হয়ে এল, শহরে সন্ধ্যা নেমেছে। জনবহুল রাস্তায় ভিখিরিরা সব হাত পেতে আছে। গোপাল ভারি ভীরু স্বভাবের—ওর হাত পেতে নেবারও সাহস নেই।

গোপালকে ভারি নির্ভরশীল ভেবে সে যখন আবার রাস্তায় তাকে ছেড়ে দিয়েছিল—ঠিক একটা রাস্তার কুকুরের মতো এদিক ওদিক হেঁটে একসময় অদৃশ্য হয়ে গেল গোপাল। গোপালের জন্য তার কেন জানি ভারি মায়া হচ্ছিল।

এবং রাতে কল্যাণী নিজের শোবার ঘরে একেবারে উলঙ্গ হয়ে গেল। শরৎকাল। নিশীথে ফুলেরা ফুটেছে। শরীরে তার আশ্চর্য সব অহমিকা—সে নিজের শরীর নিয়ে এবারে নরম সাদা বিছানায় শুয়ে পড়ল। প্রশস্ত হলঘরের মতো ঘর—ফাঁকা। দেয়ালে মায়ের বড় একটা অয়েল পেন্টিং, পাশে সাদা দেয়ালে চিত্রকরেরা নানাবর্ণের সব ছবি এঁকে রেখেছে। টি-পয়ে জল, শুয়ে শুয়ে সে খাচ্ছিল। তারপর নিজের ভেতরের জ্বালা অথবা কষ্ট ধরার অদম্য বাসনা। বড হতে হতে এসব যে কি হচ্ছে, লজ্জা অথবা অশুভ কিছু মনে হলে তার তেষ্টা পায়। এবং এ এক খেলা। মনোরম খেলায় মেতে যাবার সময় টুপ করে নিজের ভেতর ডুবে গেল কল্যাণী। হলুদ-রঙের অল্প আলো, যেন মায়াজালে তাকে ঘিরে রেখেছে। তার বাবা-মা, এবং গীতামাসী অথবা যাবতীয় প্রাণীদের এভাবে কিছু থেকে থাকে শরীরে। গোপাল তাকে সামান্য ছুঁয়ে কেন যে সব দেখতে চাইছে না!

আর এক বিকেলে গোপাল অদম্য ইচ্ছায় যখন আপন প্রবাহে লাফিয়ে পড়েছিল ঘাড়ে, তখন মনে হয়েছিল ভারি অসভ্য গোপাল। বজ্জাত। এবং ইতর। এটা একটা অসুখের মতো কিনা সে জানে না। গোপালকে তারপর সে আর একদিনও সহ্য করতে পারেনি। ঠিক একটা কাঙ্গালের মতো গোপাল এতটা যেন না করলেও পারত। গোপালের জন্য তার মায়া ছিল না। রাস্তার কুকুরের মতো গোপাল। এবার তার ফের সংগ্রহ করার পালা। সে হন্যে হয়ে আছে—কবে আবার নির্জিব, নিরুৎসাহ দুঃখী একজন মানুষ তার জন্য অপেক্ষা করবে।

তিন

মকবুল দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে বলল, মেমসাব।

কল্যাণী জানলায় দাঁড়িয়েছিল। ঠাণ্ডা বাতাস উঠে আসছে। শীত শেষ হয়ে গেছে। বসন্তের সময় এটা। চারপাশটা এখন ভারি সুন্দর লাগছে তার। বিকেলে জানলায় দাঁড়িয়ে বাগানে ফুলের সমারোহ দেখতে তার ভীষণ ভাল লাগে। এবং এ-সময় নিরিবিলি থাকাটা ভারি আরামের। হাল্কা পোশাক শরীরে। এ-সময়টাতে সে পা পর্যন্ত সিল্কের পাতলা গাউন পরে থাকে। এত হাল্কা যে স্তন, জলের ভেতর থেকে দেখার মতো এবং হেঁটে গেলে পায়ের জংঘায় সামান্য ঘাম দেখা দেয়। তখন মকবুল কেন যে বাইরে দাঁড়িয়ে ডাকছে! সে বলল, কী!

—জি মেমসাব, গুপ্তসাব ডাকছেন।

কল্যাণী এ-সময়ে, বললেই ঘরের বার হতে পারে না। সে পাতলা সিল্কের গাউন খুলে একটা লেসের ছোট জামা পরে ফেলল। তারপর স্লিপার গলিয়ে নিচে নেমে গেল। রবিবার বলে বাবার সারাটা দিন ছুটি। সন্ধ্যার সময় বাবার ক্লাবে যাবার অভ্যাস। কিছুদিন থেকে বাবা ক্লাবে অথবা আগের মতো হুঁস হাঁস গাড়িতে কোথাও বের হয়ে যাচ্ছেন না। যেন বাবার মাথায় কি একটা জটিল চিন্তা এসে ঢুকেছে। বাবাকে খুব ম্রিয়মান দেখায়। শরীরটা বোধ হয় আবার ঠিক ঠাক নেই। সে নেমে বাবার ঘরে ঢুকে দেখল, বাবার সামনে কেউ বসে রয়েছে। বাবার ঘরটা এত বড় যে অনেকটা হেঁটে গেলে সব স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সে আগে গিয়ে দাঁড়ালে গুপ্তসাব বললেন, তোমার সঙ্গে ওর আলাপ নেই। ওর নাম প্রিয়নাথ সেন। তোমার উৎপল জ্যাঠার ছেলে। বিদেশে ছিল, ফিরে এসেছে।

কল্যাণী হাত জোর করে নমস্কার করলে প্রিয়নাথ খুব বুদ্ধিমানের

মতো তাকাল। এবং প্রায় যেন চুমকি বসানো এক পোষাক কল্যাণীর শরীরে, কেবল আগুনের মতো দাউ দাউ করে জ্বলছে। প্রিয়নাথ একবার চোখ তুলেই নামিয়ে নিল। সে অন্যমনস্কভাবে গুপ্তসাবকে বলল, আপনার শরীর ভাল যাচ্ছে না শুনলাম।

—তা বয়েস হয়েছে। শরীরের আর দোষ কি বল। এবং গুপ্তসাব কল্যাণীর দিকে তাকিয়ে বললেন, প্রিয়নাথ আমাদের ফার্মে আসছে খুকু। ভালই হবে, কি বল!

কল্যাণী পাশের সোফায় বসেছিল, সে খুটিয়ে খুটিয়ে প্রিয়নাথকে দেখছে। বিদেশ থেকে এলে যা হয়, প্রিয়নাথকে ভীষণ ফিট ফাট দেখাচ্ছে। এবং প্রিয়নাথ ভীষণ লাজুক, যেন প্রিয়নাথের এতদিনের বিদেশ সফর কোন কাজেই আসছে না। এবং যেহেতু আর দশটা ছেলে ছোকরার মতো বিদেশ থেকে ফিরেই হাফ ইংরেজ হয়ে যায়নি— এবং ভাল করে ওর মুখের দিকে তাকাতে পারছে না যখন, কল্যাণীর তখন খুব একটা খারাপ লাগার কথা নয়। সে বলল, ভালই হবে।

গুপ্তসাব যেন হাফ ছেড়ে বাঁচলেন। খুকুর অপছন্দ হয়ে গেলে, ঠিক এ-ভাবে কথা বলত না। খুকু কিছুই বলত না বরং অন্য প্রসঙ্গে কথা বলত। যেন এটা একটা কথাই না। এবং খুকু এবার বেশ সহজ ভাবে কথা বলছে দেখে খুব একটা নিশ্চিন্তি। বরং ওরা কথা বলুক এটাই তিনি চান। উৎপলের বিষয়-আশয় খুব একটা ফেলনা নয়। এবং যেহেতু উৎপলের একমাত্র ছেলে প্রিয়নাথ, দুজনের টাকা মিলে ফার্মের সামান্য যে অচলাবস্থা দেখা দিয়েছে সেটা হয়তো কেটে যাবে। তিনি বললেন, তোমরা কথা বল। বরং খুকু তুমি প্রিয়নাথকে ওপরে নিয়ে যাও। তারপর ডাকলেন. রমেন বাবু। রমেন বাবু বাইরে থেকে বলল, যাই হুজুর। সে এলে কল্যাণী নিজেই অত্যন্ত সহজ গলায় বলল, চলুন ওপরে। বাবাতো কেবল কাজ করতে ভালবাসে। বাবার সঙ্গে একলা বেশি সময় বসে থাকা যায় না। দেখবেন বাবা কিছুক্ষণের ভেতরই দুনিয়ার এক্সপোর্ট ইমপোর্ট সম্পর্কে

আপনাকে সব খবর দিয়ে দেবে। এখন কোথায় কি দর যাচ্ছে, এখানে তার কি দর, পড়তা কত পড়ব আপনাকে মুখস্থ করিয়ে ছাড়বে।

গুপ্তসাব সামান্য হাসলেন। এবং এমন একজন ছেলেকে খুকুর পছন্দ হয়ে গেলে বাঁচা যায়। বরং তিনি চাইছেন, খুকুর যা স্বভাব, এই যেমন কোনো অসহায় যুবকের প্রতি তার আকর্ষণ, খুব বুদ্ধিমান ছেলের দিকে ওর একেবারে ঝোঁক নেই। কেন যে এটা হয়েছে খুকুর তিনি বুঝতে পারেন না! সেই গোপাল নামে একজন যুবকের সঙ্গে ঠিক যুবক বলা যাবে না, খুকুর কলেজের সমবয়সী বন্ধু—তাকে এনে এ-বাড়িতে যে ভাবে জামাই-আদর করে খাওয়ানো টাওয়ানো চলছিল, তিনি বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন। মা মরা মেয়েটা পাছে দুঃখ পায়, এবং যেহেতু তার নিজের বলতে এই খুকু, পারতপক্ষে খুকুর মর্জির ওপর তিনি হাত দিতে সাহস পান না। আসলে তিনি নিজে বুঝতে পারেন, একটা ভীষণ পাপ কাজ এ-সংসারে ঘটেছিল, এবং তিনিই দায়ী ছিলেন খুকুর মায়ের মৃত্যুর জন্য। হয়তো এই পাপবোধ তাকে খুকুর ওপর কোনো জোর খাটাতে দেয়নি। খুকুর পছন্দের ওপর তিনি বড় কিছু একটা বলতে সাহস পান না।

কল্যাণী সিঁড়ি ধরে আগে উঠে যাচ্ছে। প্রিয়নাথ পেছনে। প্রিয়নাথ সরলমতি বালকের মতো এ-বাড়ির ভেতর নতুন করে যেন আবার দেখতে দেখতে উঠে যাচ্ছে। একটা কথা বলতে পারছে না।

কল্যাণী নিজের মহলায় ঢোকবার সময় বলল, বাবা আপনার সঙ্গে একেবারে নতুন করে আলাপ করিয়ে দিলেন।

প্রিয়নাথ সামান্য হাসল। প্রিয়নাথের বাকব্রাস চুলে অল্প ঢেউ খেলানো। ওর কপাল প্রশস্ত, থুতনি সামান্য চাপা। নাক চ্যাপ্টা। মুখে কিছুটা মোঙ্গলিয়ান আদল। এবং প্রিয়নাথের গায়ের রঙ ঠিক শ্যামলা নয় বরং কিছুটা ফর্সা, বিদেশে থাকলে বাঙ্গালীদের যেমন রঙ খুলে যায় প্রিয়নাথের কিছুটা তেমন হয়েছে। সে পরেছে কালো রঙের ট্রাউজার। ফুল ফল আঁকা হাওয়াইন সার্ট। এবং সরু গোঁফ।

ছোট বয়সে প্রিয়নাথের মুখ যেন এমন ছিল না। কিছুটা দেখতে চাপা স্বভাবের মানুষ। এখন অবশ্য সে-সব নেই। কিছুটা লাজুক, অথবা সেই যে অনেকদিন পর দেখলে যা হয়, মোটামুটি প্রিয়নাথকে কল্যাণীর ভালই লাগছিল। বাবা তাকে যেন নতুন মানুষের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েছেন, প্রিয়নাথ প্রথমেই কিছুটা সংকোচের সঙ্গে তাকিয়েছিল—সে বোধ হয় বুঝতে পারেনি, কল্যাণী কখনও যৌবনে আগুনের মতো হয়ে যাবে। এমন পোশাকে সে কল্যাণীকে দেখবে আশাই করেনি। সে বলল, সবইতো নতুন দেখছি। ছোট্ট ফ্রক পরা মেয়েতো আপনি আর নেই। কাকাবাবু হয়তো বুঝতে পেরেছিলেন, প্রিয়নাথ আরও কিছু বলতে পারত, যেমন তার বলার ইচ্ছে ছিল, যাকে তুমি দেখেছিলে, সে আর নেই। খুকু এখন কল্যাণী হয়ে গেছে। মেমসাব না ডাকলে সে রাগ করে। কারণ সে, সিঁড়িতে কল্যাণীর ওঠার সময় লক্ষ্য করেছিল, বয় বাবুর্চিরা নিমেষে সরে দাঁড়িয়েছে রাস্তা থেকে। মেমসাব আসছে, মেমসাব আসছে। সিঁড়ি ধরে মেমসাব উঠলে বোধ হয় কারো তখন নামা ওঠার নিয়ম নেই। এবং কল্যাণী হেঁটে গেলে সবাই কেমন চুপচাপ নিষ্প্রান দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। কেউ একটা কথা বলেনি। বড় অবহেলা ভরে কল্যাণী হেঁটে গেছে। এরা সবাই সংসারে গৃহপালিত জীবের মতো। এবং কল্যণীর মহলায় ঢুকেই টের পেয়েছে প্রিয়নাথ, কোনো বালিকা যুবতী হবার মুখে এ সংসারে যা যা দরকার কল্যাণীর মহলায় তার সব আছে। দেয়ালে সব ছবি, কোন যুবতী ভেড়ার বাচ্চা বুকে নিয়ে ঘাসের উপর দাঁড়িয়ে আছে। কোথাও লম্বা টানা ফ্রেমে একটা বেড়ালের বাচ্চা, কানে দুল পরা মেয়ে। কোথাও গোলাপের পাপড়ি ফুটছে। কোথাও গাছে গাছে ফুলের সমারোহ এবং এ-যাবৎ সব দৃশ্যাবলীতে কোন বালিকার কেবল যুবতী হবার লক্ষণ। পাশে বেড-রুম, তার পাশে কল্যাণীর বসার, এবং ডানদিকে ঢুকে গেলে হল ঘরের মতো একটা লম্বা ঘর। সব বড় বড় কাচের আলমারী। দামী সব বই। মাঝখানে টেবিল, বাতিদান,

কিছু মহাপুরুষের ছবি দেয়ালে। চিনেমাটির লম্বা জারে রজনীগন্ধার স্টিক। এবং চারপাশে যেদিকে তাকানো যায় কল্যাণী একেবারে সরেস হয়ে আছে। ছুঁয়ে দিলেই পাতলা সিল্কের পোশাক উড়ে যাবে, এবং স্তনে সব কারুকার্যময় অতীব বাসনা হুলের মতো জ্বালা ধরিয়ে দেবে। সে বলল, খুকু আমি যদি রোজ আসি রাগ করবেনাতো!

কল্যাণী বুঝতে পারল, প্রিয়নাথ আগের সম্পর্কটা আবার ঝালিয়ে নিতে চায়। সে বলল এস। তারপর সামান্য তাকিয়ে বলল, এত লোভ কেন?

প্রিয়নাথ বলল, তোমার সংগ্রহে কত রকমের বই। তুমিতো জানো বই পড়ার আমার ভারি নেশা।

কল্যাণী বলল, অঃ! সে এবার বলল, বোস। তুমি বাবাকে দেখতে এসেছিলে?

—না। সত্যি কথা বলা ভাল। তোমাকে দেখতে এসেছিলাম। তুমি কত বড় হয়েছ দেখতে এসেছিলাম।

—আমার কথা তোমার মনে ছিল!

—বারে যখন যাই তখনতো তুমি ফ্রক পরে ছুটোছুটি করতে।

—এখন! বলে কল্যাণী মুচকি হাসল।

—এখন জানিনা, কি নিয়ে তুমি আছ। কি নিয়ে তুমি ছুটোছুটি করছ!

—কিছুই নেই আমার। পড়াশোনা শেষ। বাবা বলেছিলেন বাইরে যেতে। স্কলারশিপ চেষ্টা চরিত্র করলে পেয়ে যেতাম। আমার আর কিছু ভাল লাগছে না। তুমি এসেছ ভালই হয়েছে।

—প্রিয়নাথ যেন ভীষণ জোর পেয়ে গেল বলল, এখানে আসার আগে খুব একটা ভয় ছিল। কোথায় কি ভাবে আবার নতুন করে জীবন আরম্ভ করতে হবে ভাবলেই বুক ঢিপ ঢিপ করত। বাবাতো কিছুতেই আর বিদেশে থাকতে দিতে রাজী না। মার লম্বা লম্বা চিঠি। এখানে এসে জানলাম কাকাবাবু অনেকদিন থেকে আমার খোঁজখবর

নিচ্ছেন। এসে ভালই করেছি। কি বল।

– খুব ভাল করেছ! কি খাবে?

—কি খাব আবার। আমাদের বাড়ি এস না একদিন। ভাল সব রেকর্ড এনেছি। বাজিয়ে শোনাব।

কল্যাণীর অনেকদিন পর প্রিয়নাথের মার কথা মনে পড়ে গেল। আবার ও বাড়ির সঙ্গে একটা সম্পর্ক গড়ে উঠছে। ওর যতদূর মনে আছে মায়ের মৃত্যুর পর উৎপল জ্যাঠা এবং জ্যেঠিমা আর এ-বাড়িতে আসতেন না। বাবার যৌবন বয়সের বন্ধু। এবং ফার্মের সঙ্গে উৎপল জ্যাঠার কি একটা দায়বদ্ধ কাজও ছিল। বাবা কি করে সব হাতিয়ে নিয়েছিলেন, অথবা বাবা আদৌ হাতিয়ে নিয়েছিলেন না নিয়ম মাফিক সময় পার হয়ে গেলে বাবারই সব হয়ে যাবার কথা ছিল কল্যাণী ঠিক জানত না। দু-বাড়ির সম্পর্কে একটা ভয়ংকর রকমের ব্যাবধান ক্রমে বাড়ছিল এটা সে কেবল বুঝতে পারত। বাবা আবার কেন যে সম্পর্কটা জোড়াতালি দিতে চাইছেন! বয়েস হলে বোধ হয় এটা হয়। বাবা প্রিয়নাথকে ফার্মের অংশীদার করে নিতে চাইছেন। আসলে ফার্মের অংশীদার না বাবার মেয়েটির অংশীদার, কোনটার জন্য বাবা এত ব্যস্ত সে এ-মুহূর্তে বুঝতে না পেরে বলল, যাব।

গেলে মা ভীষণ খুশি হবে।

কল্যাণী বলল, তোমার সঙ্গে বাবার কি কথা হল।

– তেমন কিছুই না। তবে বাবা বললেন, তুই একবার ওর কাছে যা। কি দরকার আছে তোর সঙ্গে।

—জ্যাঠামশাইকে বাবা কিছু বলেন নি।

– বলতে পারেন, তবে বাবা আমাকে ভেঙ্গে কিছু বলেন নি।

কল্যাণী বুঝতে পারছে দুই প্রৌঢ় সবই জানে। এবং এটা তার খুব খারাপ লাগছিল না। প্রিয়নাথকে এখনও খুব চতুর মনে হচ্ছে না। বিদেশ থেকে ফিরে এলে যে অহংকারী মুখ থাকে, তাও

ওর চোখ মুখ দেখে বোঝা যাচ্ছে না। বরং মনে হচ্ছে সে কল্যাণীর সঙ্গে এই যে বিকেলে গল্প করে সময় কাটিয়ে দিতে পারছে তাতেই সুখী। বৈভবের প্রতি তার বিন্দুমাত্র টান নেই। এবং কল্যাণীকে ভালবেসে সে বনবাসে চলে যেতে পারে।

তাছাড়া এ-সব সময়ে যা মনে হয়ে থাকে, তুমি তো অনেকদিন বিদেশে ছিলে, তোমার শরীর ব্যবহারে পুরোনো হয়ে গেছে জানি, তুমি সুবোধ বালকের মতো পড়াশোনা করেছ আর কিছু করনি এটা আমার বিশ্বাস করতে কষ্ট হয়। তবু প্রিয়নাথ যে-ভাবে তাকাচ্ছিল তাতে মনে হচ্ছে সে প্রথম এই যুবতী সংস্পর্শে ভারি মুগ্ধ। লোলুপতা আছে বলে মনে হচ্ছে না। কল্যাণী ডাকল, রতন!

—যাই মেমসাব।

যেন দরজায় কান পেতে আছে। রতন এলে বলল, দু কাপ কফি পাঠিয়ে দে।

কফি এলে ওরা দু'জন মুখোমুখি বসে কফি খেতে থাকল।

তারপর কল্যাণী একদিন ফোন পেল, এই তুমি কবে আসবে।

—কোথায়।

—চলে এসনা। এখান থেকে একসঙ্গে বের হব।

—কোত্থেকে বলছ!

—অফিস থেকে।

—বাবা আছেন!

—হ্যাঁ আছেন।

- কি ভাববেন!

—কি আবার ভাববেন! তোমার জন্য এখানে চেম্বার হচ্ছে!

—যা!

—হ্যাঁ। তিনি তোমাকে অবাক করে দেবেন বলে কিছু বলেন নি।

—আমাকে বসতে হবে!

—বসা উচিং। তোমার কি আছে না আছে দেখে নেবে না।

—তোমরাইতো আছো।

—ঠকাতে পারি।

—ও-সব আমি ভাবি না।

—এস লক্ষ্মীটি।

এবং কল্যাণী রতনকে ডাকল। রতন এলে বলল, সুজিতকে গাড়ি বের করতে বল।

গাড়িতে যখন কল্যাণী যাচ্ছিল তখন কেমন একটা উদাস ভাব, যেন, এই শহরে সত্যি একজন তার জন্য ভীষণ ভাবে। গোপালটা যে কি ছিল। কি দরকার ছিল ধূর্তের মতো ব্যবহার করা! এভাবে কখনও হাত দিতে আছে। কেমন কাঠ কাঠ। ভালবাসাটা পর্যন্ত রপ্ত করতে পারেনি। এটাতো আর কাঠে তৈরি নয়। অধিকাংশ যুবকেরা এটা বোধ হয় জানে না। কেমন নিষ্প্রান আততায়ীর মতো হাত ঢুকিয়ে দেয়। সে গাড়িতে উঠে যাবার মুখে বুঝতে পরল, বাবা তাকে ডেকে পাঠিয়েছেন। প্রিয়নাথ মধ্যস্থতার কাজ করেছে। সব অফিস ঘুরিয়ে দেখানো হল। বেশ লোকগুলো। এবং সে যেতে যেতে দেখল সবাই দাঁড়িয়ে গেছে। এবং কল্যাণীর যা হয়, তখন সোজাসুজি তাকাতে পারে না। সে তেমন কিছু দেখছে না মতো করে গট গট করে হেঁটে চলে যাচ্ছে। প্রিয়নাথ পথ দেখিয়ে প্রথমেই গুপ্তসাবের ঘরে ঢুকিয়ে দিল। তিনি বললেন, তোমাকে সারপ্রাইজ দেব ভেবেছি। কাল থেকে তুমি বসবে। তোমার বসার ঘরটা দেখে যাও। বেল টিপতেই বেয়ারা হাজির। প্রিয়নাথ সুবোধ বালকের মতো মুখ করে বসে আছে। গুপ্তসাব বেয়ারাকে বললেন, স্বদেশকে ডাকো। তিনি কবার নাম ধরে ডাকলেন। এবং যেহেতু তিনিই সব, তিনি বেছে বেছে চতুর এবং পরিশ্রমী যুবকদের কাজ দিয়ে থাকেন। সবাইকে কখনও তুই তুকারি পর্যন্ত করেন। কিন্তু এই স্বদেশ ভিন্ন স্বভাবের মানুষ। তাকে তিনি বরং

সামান্য সমীহ করে কথা বলেন। এবং যেহেতু চতুর বলতে যা বোঝায় স্বদেশ ঠিক তা নয়, পরিশ্রমী এবং বিচক্ষণ। এবং এই স্বদেশের বেলায় বিচক্ষণ কথাটা খুব উপযুক্ত। সবচেয়ে যা তার স্বভাব, সে কাজকর্মের প্রতি ভীষণ বিশ্বাসী মানুষ, এবং সৎ বলে বেশ সুনাম ইতিমধ্যেই অর্জন করেছে। কাজকর্ম খুব সহজে বুঝে ফেলেছে। দায়ীত্বশীল। এখন বলা যাবে স্বদেশ ফার্মের সব কিছু তাঁর চেয়ে বেশি জানে। তিনি স্বদেশ এলে কল্যাণীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। বললেন মেমসাব কাল থেকে বসবেন। তুমি ওর ফাইল পত্র কাল বুঝিয়ে দেবে।

স্বদেশ বলল, আচ্ছা স্যার।

কল্যাণী কেমন গণ্ডগোলের ভেতর পড়ে যাচ্ছে। বলার ইচ্ছে বাবা এ-সব কি হচ্ছে। আমি এ-সব কিছু বুঝি না। মুখে দুশ্চিন্তা ফুটে উঠতেই গুপ্তসাব কি ভেবে বললেন, স্বদেশ তোমাকে সব কাজে সাহায্য করবে। স্বদেশ ডেভালপমেণ্টের দিকটা দেখে থাকে। প্রিয়নাথ এ্যাড্‌মিনিস্ট্রেসন। তুমি ফিনান্স দেখবে। আমার ছুটি।

কল্যাণী দেখল স্বদেশ ওর দিকে সেই যে হাত তুলে একবার নমস্কার করেছিল আর একবারও তাকায় নি। সে চুপচাপ আবার চলে গেল। এবং গুপ্তসাব স্বদেশ চলে গেলেই বললেন, ফার্মের দুঃসময়ে ছেলেটা খুব খেটেছে। মনে হয় আর ভয় নেই। অনেকগুলো অর্ডার হাতে এসে গেছে। এজেন্সি হাউসগুলো মোটামুটি খুশি। এখন তোমরা তিনজনে একে আর যতটা এগিয়ে নিতে পারো।

প্রিয়নাথ বলল, সব ঠিক হয়ে যাবে।

কল্যাণী বলল, আমার এ-সব ভাল লাগে না বাবা।

—ভাল লাগে না জানতাম। তাই তোমাকে আগে থেকে কিছু বলিনি। প্রিয়নাথ আসায় আমি নিশ্চিন্ত। তুমি আসায় আমার ছুটি।

কল্যাণী বাবার মুখ দেখল। মাথার চারপাশে সামান্য কাচা পাকা চুল। বাবা খুব লম্বা নন বলে, শরীরের সামান্য মেদ চোখে লাগে। এবং বাবা ঢোলা প্যান্ট কোট এখন পরতে ভালবাসেন। বাবার লম্বা গোঁফ থাকা সত্বেও কল্যাণীর কেন জানি মনে হচ্ছিল বাবা বুঝি সত্যি তবে ছুটি চাইছেন।

অফিস ছুটির পর একদিন প্রিয়নাথ বলল, কল্যাণী যাবে?

কোথায়।

—এই একটু চল না।

অন্যদিন অফিস ছুটির পর প্রিয়নাথ কোথায় যায় কল্যাণী জানে না। আজকাল রবিবারে শুধু সকালের দিকে প্রিয়নাথ আসে। বিকেলে প্রিয়নাথের পাত্তা পাওয়া যায় না। বোধ হয় বিকেলে প্রিয়নাথ কোথাও পানাহার করে থাকে। কল্যাণী মনে মনে ভীষণ হাসত। এই পানাহার ব্যাপারটি তার পরিবারে অনেকদিন থেকে আছে। বাবাতো এখন বাড়িতেই সন্ধ্যা হলে বসে যান। মাঝে একদিন কিছু সেলিব্রেট করার মতো বাবা প্রিয়নাথকে সঙ্গে নিয়েছিলেন। প্রিয়নাথ খুব একটা পছন্দ করে না এমন মুখ করে খেয়েছিল। এবং কল্যাণী মাঝে মাঝে খবর নিয়ে গেছে—দরকার মতো মকবুল খাবার পাঠিয়েছে। বাবার খাস খানসামা তদারক করেছে সব কিছুর। প্রিয়নাথ যে খেতে পারে এবং নেশা করার অভ্যাস পুরোমাত্রায় এটা সে সেদিন বাবার চেয়ে বেশি বুঝতে পেরেছিল। নেশা করার ব্যাপারে তার আপত্তি থাকার কথা না। আধুনিক ছেলেরা একটু নেশা করবে না সে ভাবতেই পারে না। প্রিয়নাথের ছলনা ওর পছন্দ নয় একেবারে। এবং প্রিয়নাথ বুঝতে পেরেই হয়তো কল্যাণীকে বিকেলে সঙ্গ দিতে আর সাহস পাচ্ছিল না। তবু এমন আগুনের মতো রূপবতী যুবতীর সঙ্গে নিভৃতে বসে খাওয়ার একটা নেশা বেশ ক'দিন থেকে ওকে কাবু করে ফেলছিল। কল্যাণীর শরীর হাত পা, এবং বিছানায় কল্যাণীর

শরীরে উলঙ্গ অবস্থায় কি সব রহস্য থাকবে সে অনুমান করতে পারে। তার মালিকানা বর্তাবে কল্যাণীর ওপর। সুতরাং কল্যাণীকে আগে থেকে সামান্য রপ্ত করে নিতে পারলে সংসারে অশান্তি থাকবে না।

কল্যাণী বলল, চল। তারপর কল্যাণী স্বদেশকে ডেকে পাঠিয়েছে। এলে বলল, আজ থাকল। কাল আবার দেখব।

স্বদেশ বলল, আজকে দেখে রাখলে ভাল হত। কাল পার্টি দশটার ভেতরই চলে আসবে।

কল্যাণী তাকাল স্বদেশের দিকে। সাদা প্যাণ্ট পরেছে এবং সাদা সার্ট। গলায় টাই অলিভ কালারের। ওর চওড়া কাঁধ। চোখে মুখে যেন কোনো আকাঙ্ক্ষা নেই। সে বলল, প্রিয়নাথের সঙ্গে জরুরী দরকারে বের হচ্ছি। এবং কল্যাণী স্বদেশকে আর কোনো কথা বলতে দিল না। চাবির রিঙ ঘুরাতে ঘুরাতে উঠে গেল। স্বদেশ দেখল মেমসাব খুব খোশ মেজাজে আছে। ভাবি বরের সঙ্গে বিকেলে সামান্য বেড়াতে ইচ্ছে হওয়া খুব স্বাভাবিক। সে বোকার মতো কিছু না বললেই পারত।

বড় একটা হোটেলের সামনে গাড়ি থামলে কল্যাণী বলল, এখানে কেন?

—আজ একটু খাব ভাবছি। যেন কোনোদিন প্রিয়নাথ খায় না। সামান্য সখে খাওয়া। কল্যাণী বলল, বাড়িতে চল।

প্রিয়নাথ ভাবল, কল্যাণী ঠিক বুঝতে পারে নি। একটু বিশদ করে বুঝিয়ে বলার দরকার। সে বলল, তোমার অসুবিধা হবে···? কারণ—

—ও আমি বুঝি। তুমি কি খাবে আমি জানি।

প্রিয়নাথ বাড়ি এসে কল্যাণীর মহলায় ঢোকার মুখে দেখল, সিড়ির পাশে মকবুল দাঁড়িয়ে আছে। মকবুলকে কল্যাণী ব্যাগ থেকে কিছু টাকা বের করে দিল। তারপর কাগজে লিখে দিল

কিছু। সোজা ওর ঘরে নিয়ে আসার নির্দেশ দিলে প্রিয়নাথ কেমন হাল্কা হয়ে গেল। সে ভেবেছিল, কল্যাণীর পাল্লায় পড়ে সন্ধ্যাটা মাটি হতে যাচ্ছে। ভীষণ বেকায়দায় পড়ে গেছে এমন ভাবছিল। এখন মকবুলকে সব বলতেই সে কেমন রা রা করে গান গেয়ে উঠল। কল্যাণী বলল, হাত মুখ ধুয়ে নাও। আমি আসছি বলে সে বাথরুমে ঢুকে গেল।

এবং যখন ওরা বেশ পরিপাটি করে সেজে বসেছিল টেবিলে, তখন রতন দরজার পাশে, কখন কি দরকার পড়বে ভেবে দাঁড়িয়ে আছে। তখন সূর্য অস্ত গেছে। ঘরে ঘরে সব লাল বর্ণের আলো—এবং কল্যাণী খুব হাল্কা পোশাকে এসে বসেছে। কল্যাণী গ্লাসে ঢালার সময় বলল, কতটা! অভ্যাস নেই, প্রথম প্রথম কম খেতে হয়! বলে চোখ তুলে সামান্য হাসল।

—দাও। খেতে পারি! তুমি?

—আমিও পারি।

—তোমাকে ভীষণ আদর করতে ইচ্ছে করছে মেমসাব।

—খাও, তারপর দেখা যাবে।

কল্যাণী সামান্য কাজু বাদাম মুখে দিয়ে বলল, স্বদেশটার বুদ্ধি-শুদ্ধি একেবারে কম।

—খুব কম। আগাপাশতালা ঠিক নেই।

—তোমার সঙ্গে বের হব, আর কি সাহস, বলে কিনা……

—সাহসতো ওকে কাকাবাবু দিয়েছেন। একটা উজবুককে এমন মাথায় করে রাখা কেন বুঝি না। তারপর চিয়ার বলে দুজনই তুলে যখন সোনালী গ্লাসে চুমু খেল, তখন বোঝা গেলনা কল্যাণী ভেতরে ভেতরে এমন জ্বালা বোধ করছে কেন! সে দু চারবার খেয়ে গ্লাস খালি করে ফেললে, কেমন জ্বালাটা ছাই চাপা আর থাকছে না। কে যেন ওটা বাতাস দিয়ে উসকে দিচ্ছে।

প্রিয়নাথ উঠে গিয়ে স্টেরিও চালিয়ে দিল। গম গম করে সারা

ঘরে মিউজিক বাজছে। কল্যাণীর হাত লম্বা হয়ে যাচ্ছে। আঙ্গুল-গুলো চাঁপাফুলের মত ছড়িয়ে পড়েছে। এবং পোশাকের ভেতর হাল্কা নীলাভ আভা। কল্যাণী যেন ক্রমে কেমন মুহ্যমান হয়ে পড়ছে। ওর খোপা এখন ঠিক নেই। এবং হাতে পায়ে ফুলের সৌরভ। ওর আঁচল বুকে ঠিক থাকছে না। আর কি যেন দেখছে প্রিয়নাথের মুখে। প্রিয়নাথ খুব বদজাত, না হলে সে কি করে এমন একটা সুযোগ পেয়ে গেল। বোধ হয় সেই জ্বালাটা ভেতরের, বদ াত প্রিয়নাথ এমন মনে করিয়ে দিল। সে বলল, স্বদেশটা কি ভাবে?

প্রিয়নাথ বলল, স্কাউণ্ড্রেল। আমি জানো স্কাউণ্ড্রেলদের বিশ্বাস করি না। বাকাবাবু এত কেন যে বিশ্বাস করেন।

কল্যাণী বলল, একটা গাধা।

প্রিয়নাথ উঠে দাঁড়াল। চুপচাপ কিছুক্ষণ খেয়ে সে আবার কাজু-বাদাম দাঁতে কাটছে। মিউজিক পাল্টে যাচ্ছে। কল্যাণীর হাত ধরে ওর ভারি নাচতে ইচ্ছে করছে। হল ঘরের মত এমন একটা বড় ঘরে সে বেশ কল্যাণীকে নিয়ে নাচতে নাচতে কোনো আড়ালে চলে যেতে পারলেই অথবা মনে হচ্ছে চারপাশে কোনো কাকপক্ষি জানে না সে আর কল্যাণী এই ঘরে, এ সব ঘরে হুকুম না থাকলে ঢোকার অনুমতি নেই—এবং এত বড় খাটে কল্যাণী একা শোয় শুয়ে থাকলে ওর শরীরের সায়া শাড়ি ঠিক থাকে না, নাকি নাইটি পরে শোয় কল্যাণী, ভিতরে প্যান্টি না থাকলে কি রকম দেখাতে পারে, সে কল্যাণীর শরীরে, এভাবে তাকিয়ে মনে মনে সবটা আন্দাজ করছিল। কল্যাণীর একটা হাত নিয়ে চুমু খেল। কল্যাণী কিছুই বলছে না। সে শুধু বলল, আমি আর খাব প্রিয়।

—খাওনা। এ-বয়সে খাবে নাতো মা মাসী হলে খাবে?

—তা ঠিক। তুমি কিন্তু বেশি খাচ্ছ?

—কোথায়! সে গ্লাসটা তুলে দেখল। যেন আদৌ খাচ্ছে না এ-ভাবে জলের মতো সবটা গলায় ঢেলে বলল, বুঝলে কল্যাণী

স্বদেশটা স্কাউণ্ড্রেল না হলে মা ভাইবোনদের এমন কষ্ট দিতে পারে ?

—ওর তো বিয়ে হয় নি।

—আরে ধুস। তুমি যে কি না। বলে সে উঠে দাঁড়াল।

জানালা পর্যন্ত হেঁটে গেল। এতটুকু পা টললো না। খুব বুদ্ধিমানের মতো সে কথাবার্তা বলার চেষ্টা করছে। একটা ফ্ল্যাটে থাকে স্বদেশ।

এতদিন এখানে কাজ করছে একটা বাড়ি পর্যন্ত করতে পারছে না। সবাইকে একটা ফ্ল্যাটে রেখে কষ্ট দিচ্ছে। হাজার বারোশ টাকায় কি হয় আজকাল। জীবনটাকে একেবারে মাদি শূয়োরের মতো করে রেখেছে। খাটো খাও, বাচ্চা পোষো। তাও আবার নিজের নয়, এক গাদা ভাই বোন।

কল্যাণী বলল, তুমি এত জানো।

প্রিয়নাথ এগিয়ে এসে বলল, মিমি প্লিজ ডাউন এ কিস্। তার পরই দামাল হয়ে পড়লে কল্যাণীর যে কি হয়ে যায়—সে কেমন ভেতরে অতিশয় ঘৃণা অথবা বলা যায় লোভ এই প্রিয়নাথের ধরতে পারে এবং সঙ্গে সঙ্গে শাড়ি সামলে, না না প্রিয় এটা তুমি ঠিক করছ না। তুমি আমার দুর্বলতার সুযোগ নিচ্ছ। আমি এটা চাইনি প্রিয়, তুমি হাত দেবে না। সরিয়ে নাও। বলেই প্রায় ঠেলা মেরে খাটে ফেলে দিয়ে বাইরে এসে দরজা বন্ধ করে দিল। এবং আবার বাথরুম, মাথা ঝাঁ ঝাঁ করছে। আবার সেই জ্বালা স্বদেশটা সত্যি আহাম্মক। রক্ত জল করে সে গুপ্তনিবাসের স্পর্ধা বাড়িয়ে দিচ্ছে। গুপ্তনিবাসকে শয়তানের আবাস করে তুলেছে।

বাথরুমে সে সব খুলে ফেলল। তারপর বাথটবে ডুবে গেল। যা কিছু মনোরম এখানে এখন, জংঘায় হাতে পায়ে এবং কোমল সব উলের মতো নরম জায়গা সে সাফ করে বার বার পবিত্র থাকতে চাইল গোপাল অথবা প্রিয়নাথ সেই এক মানুষ, ঘাড়ে লাফিয়ে পড়তে চায়। হাত দিয়ে কেমন ইতর ইচ্ছে সব দেখতে ভালবাসে।

তার চেয়ে কেন জানি ভাল লাগছে- স্বদেশ, ভারি সৎ যুবক। স্বদেশের জন্য ওর ভারি মায়া হচ্ছে। সে জংঘা এবং উরুর মতো নরম সব জায়গা সাবানের ফেনায় ডুবিয়ে রাখতে চাইল। তারপর কাঁচের মতো স্বচ্ছ জলে সব ধুয়ে সত্যি পবিত্র হয়ে গেল। প্রিয়নাথের মুখ দেখতে পর্যন্ত ইচ্ছে করছে না। কোন রকমে রাতের পোশাক পরে সে ডাকল, মকবুল, মকবুল।

—জি মেমসাব।

—ওকে গাড়িতে তুলে দাও।

দরজা বন্ধ আছে মেমসাব।

— খুলে নাও।

প্রিয়নাথ মাতাল হয়ে গেছে। সে বিড় বিড় করে কি বকছিল। কল্যাণীর মনে হল একটা শয়তান প্রিয়নাথ। চলে গেলে ভারি নিশ্চিন্ত সে। সেই যে গমগম করে মিউজিক বেজেই চলছিল, এখন তা থামিয়ে দিল। যেন এক নিরিবিলি ঘর. সাদা ফ্লোরোসেণ্ট বাতি জ্বলছে না, অন্ধকার। সামান্য চাঁদের আলো এসে পড়ছে পায়ের কাছে। নিজেকে দেবী টেবি ভাবতে ভাল লাগছিল কল্যাণীর। সে চুপচাপ এখন বসে বসে আকাশের জ্যোৎস্না দেখছে। পাশে স্বদেশ বসে থাকলে কেন জানি মনে হচ্ছিল ভারি ভাল লাগত। এমন জ্যোৎস্না উঠলে মনের ভেতরে কি যে সব জেগে ওঠে। ঠিক কি যে থাকে সে বুঝতে পারে না। যেন স্বদেশই একমাত্র এই আবাসকে শয়তানের হাত থেকে রক্ষা করতে পারে। এবং কখন সেই বেলকনিতে কল্যাণী স্বদেশের কথা ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়েছিল জানে না। সারারাত স্বদেশকে সে স্বপ্নে দেখেছে। স্বপ্ন দেখতে দেখতে কখন যে সে স্বদেশকে ভালবেসে ফেলেছে।

চার

তারপর অনেক দিন পরে·· ···

বৃষ্টির মধ্যে প্রথম মানুষটা এসে দরজায় দাঁড়াল। কল্যাণী অসময়ে দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ শুনে প্রথমে সামান্য বিস্মিত হল। অস্পষ্ট অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আছে। জানালা থেকে দরজার ওপাশটায় যে মানুষটা দাঁড়িয়ে আছে দেখা যাচ্ছে। কে এমন বিদেশে এত রাতে তার দরজায় এসে কড়া নাড়ছে! কল্যাণী প্রথম কি ভাবল, তারপর সন্তর্পণে দরজা খোলার আগে প্রশ্ন করার মুহূর্তে মনে হল —মানুষটা তার চেনা চেনা, সেই মানুষ শেষ পর্যন্ত এখানে এসেও হানা দিচ্ছে। সে বিব্রত এবং কি বলবে ভেবে পেল না। এতদূর থেকে মানুষটা ফের তার খোঁজে চলে এসেছে। অগত্যা দরজা খুলে দিতে হল। কল্যাণী দরজা খুলে দিয়ে বলল, তুমি!

—কেন আসতে নেই?

কল্যাণী বুঝল মানুষটা যখন ঘর খুঁজে আবার এসেছে তখন কিছু বলা নিরর্থক।

সে শুধু বলল, অমল অসুস্থ।

—কি হয়েছে?

—কিছুদিন থেকে জ্বর। এখন আবার অন্য উপদ্রব বেড়েছে। কাশি হচ্ছে থেকে থেকে।

—ডাক্তার?

—সব দেখানো হচ্ছে। তুমিত জান আমার সামান্য আয়, তা দিয়ে আমি যথাসাধ্য করছি।

স্বদেশের মুখ বড় বিষণ্ণ দেখালো। গম্ভীর থাকলে স্বদেশকে কেমন রোগা দুঃখী মানুষ বলে মনে হয়। কেন যে এত টান, কি যে সঙ্গে করে এনেছে এই মেয়ে সে যেন কিছুতেই বুঝে উঠতে পারে না। যত পালিয়ে বেড়াচ্ছে তত স্বদেশ হন্যে হয়ে খুঁজছে। স্বদেশ খুব আস্তে আস্তে বলল, আমি আজ এখানে থাকতে এসেছি কল্যাণী।

—তুমি কি পাগল। এখানে তুমি থাকবে।

কেন, অসুবিধার কি আছে। কিছু না হয় নাই করলাম, কিন্তু থাকার অধিকারটা কি করে কেড়ে নেবে।

কল্যাণী ধীরে ধীরে হেঁটে এল। কি বলবে এই মানুষকে—কেমন ইতর মনে হচ্ছে কথাবার্তা। এই মানুষ তার ঘরে থাকতে এসেছে। এখন কি বলা যায় স্বদেশকে—সে দরজা পর্যন্ত এসে ঘাড় ফেরাল, তোমাকে ত বলেছি অমল অসুস্থ। ওর কঠিন অসুখ। তুমি এখানে থাকতে পারবে না।

স্বদেশ দরজা পর্যন্ত কিছু না বলে হেঁটে এল। ফেল্ট ক্যাপটা মাথা থেকে খুলে পাইপে সামান্য আগুন দিল। তারপর পাশের জানালাতে সামান্য সময় দাঁড়িয়ে দূরের পাহাড়ে হলুদ নীল আলো জ্বলতে দেখল। শরতের বৃষ্টি বেশীক্ষণ থাকার কথা নয়। বেশীক্ষণ আকাশে মেঘও থাকার কথা নয়, বরং এই মেঘ এখুনি কেটে যাবে। যেন সে বলতে চাইছে—এই যে তুমি সহর থেকে সহরে পালিয়ে বেড়াচ্ছ, এই যে তুমি বিহারের এমন প্রত্যন্ত অঞ্চলে কাজ নিয়ে চলে এসেছ আমার কি ইচ্ছা হয় না আমিও তোমার সঙ্গে এমন লুকোচুরি খেলে বেড়াই, যা তোমাকে এবং আমাকে আরও রহস্যময় করে তুলবে। বস্তুত সে অনেক কিছু বলতে পারত। বলতে পারত আমি তোমার স্বামী কল্যাণী। তোমার সব বলতে আমি। আমি আসি যাই. তোমার ওপর জোর করি না, কারণ মনে হয় মাঝে মাঝে তুমি বড় ছেলেমানুষ। কেমন আদরে আদরে তোমার মাথাটা একেবারে বিগড়ে গেছে। আমি তোমার জন্যই এসেছি বলতে পার—কিন্তু সে কিছু বলল না। ঘরের ভিতরে ঢুকে গেল। পাশে টানা বারান্দা। কিছু ওষুধপত্রের গন্ধ আসছিল। বোঝা যাচ্ছে বাঁদিকের ঘরে অমল আছে। ওর কাশির শব্দ শোনা যাচ্ছিল।

হাঁটতে হাঁটতে স্বদেশ বলল, কতদিন ধরে এমন হচ্ছে।

—মাস তিনেক।

—এখনও ঘরে রেখেছ! ওকে হাসপাতালে দেওয়া উচিত ছিল।

কল্যাণী কি ভেবে মাথার কাপড়টা তুলে দিল। ঘাড় ফিরিয়ে একবার দেখল স্বদেশকে—বড় স্বার্থপর মানুষ তুমি স্বদেশ, আমি তোমাকে চিনি, এসব বলার ইচ্ছা হল। বলতে গেলে যেন গড়গড করে তার সব বের হয়ে আসবে। বরং অন্যমনস্ক হওয়া ভাল। স্বদেশের এই আগমন আদৌ মনঃপুত নয়। যেন মাঝে মাঝে এসে অথবা চিঠিতে খবর নিয়ে ভিতরের আগুনটাকে উসকে দেবার ইচ্ছা। কিন্তু তুমি জাননা স্বদেশ, ওটা আমার মরে গেছে। তোমাকে দেখলে এখন আর যেন কিছুতেই কিছু মনে হয় না। তোমাকে দেখলে আমি বরং অন্যমনস্ক থাকতে ভালবাসি।

স্বদেশ টেবিলের ওপর ফেল্ট ক্যাপটা প্রথম রাখল। কল্যাণী ওকে বসতে বলছে না, কল্যাণী এখন অমলের ঘরে কি করতে গেছে কে জানে। সে কি অমলকে বলতে গেছে, স্বদেশ আমাদের কিছুতেই ভুলতে পারছে না, আমাদের কোথাও শান্তিতে বসবাস করতে দিচ্ছে না! কল্যাণী তুমি ওঘরে কি করছ! অমল তোমাকে কি দিয়েছে! সে ত আমার আশ্রিতজন ছিল। সে সরল মানুষ ছিল, ভালোবাসার মত দুটি বড অসহায় চোখ ছিল। এখন সে কেমন? আমি যদি অমলের ঘরে যাই তুমি কি রাগ করবে? ভাবতে ভাবতে স্বদেশ ইজিচেয়ারটাতে গা এলিয়ে দিল। অমলের আর কি ছিল কল্যাণী? শিল্পের প্রতি সামান্য আকর্ষণ ছিল, আর কি ছিল? যেমন বলতে পার আমার এবং প্রিয়নাথের ভিতর আর্থিক বৈষম্য ছিল, প্রতিপত্তির দিক থেকে প্রিয়নাথের সমকক্ষ হব স্বপ্নেও ভাবি নি, বরং বলতে পার আমি অসহায় ছিলাম। প্রিয়নাথ এবং আমি তোমার বাবার এতবড় এক্সপোর্ট ইম্পোর্ট বিজিনেসের দুই বিশ্বস্ত কর্মচারী, বিদ্যায় বুদ্ধিতে প্রিয়নাথ প্রবল। আর বিশ্বস্ত হিসাবে তাঁর আমার ওপর বেশী আস্থা ছিল। অথচ বুদ্ধির বলে যখন প্রিয়নাথ তোমার বাবাকে হাত করে তোমাকে পাবার চেষ্টা করছিল, তখন একদিন আমার প্রতিপত্তি কম

জেনেও ছুটে এসেছিলে। ঘরে ঢুকে বলেছিলে, স্বদেশ তুমি আমাকে কোথাও নিয়ে চল। আমি তোমার সঙ্গে যাব।

কোথাও আলো জ্বলে দপ দপ করে নিভে গেলে স্বদেশের এমন সব মনে হয়। প্রাচীন ইতিহাসের সব ছবি মনের পাতায় ভরে যেতে থাকে। সে যত হাঁটছিল এই ঘরে, কারণ সে ইজিচেয়ারে বসে স্বস্তি পাচ্ছিল না, মনের ভিতর কি এক মন আছে, যাকে সে ধরতে পারে না, যে মনটা কেবল ওকে কল্যাণীর কাছে বার বার নিয়ে আসে। কল্যাণীর সব অবহেলা ওকে কেমন যেন নিশিদিন কাতর করে। স্বদেশ দরজার কাছে এসে অমলের ঘরে উঁকি দেবার সময় অকারণ খুক খুক করে কাশল। অমল এবং কল্যাণী ভিতরে আছে ওদের একান্ত ব্যক্তিগত জীবন ধরা পড়ে যাবে স্বদেশের চোখে, স্বদেশ যেন সেজন্য, এই যে আমি কল্যাণী, আমি তোমাদের ঘরে ঢুকছি, সুতরাং সন্তর্পণে একটু কেশে সজাগ করে দেওয়া ভাল, আমি এবার তোমাদের ঘরে ঢুকব। বলে সে পর্দা তুলে ঘরে ঢুকতেই অমল কেমন শক্ত হয়ে গেল, ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে গেল।

কল্যাণী বিরক্ত হয়ে বলল, তুমি আবার এখানে কেন? কি দরকার তোমার।

স্বদেশ কল্যাণীর দিকে তাকাল না পর্যন্ত। সে দাঁড়িয়ে থেকে বলল, তুমি কেমন আছ অমল?

—আমি ভাল আছি স্যার। আপনি। আপনি স্যার কেমন আছেন। সে উঠে বসবার চেষ্টা করলে স্বদেশ বলল, তুমি শুয়ে থাকো। তুমি ব্যস্ত হবে না। সে এবার চোখ তুলতেই দেখল, এ ঘরে আর কল্যাণী নেই। জানালায় কিছু পাতাবাহারের গাছ। এখন এই মফঃস্বল সহরে জ্যোৎস্না নেমে এসেছে। সামনে রেলের গুমটি ঘর। ঘর পার হলে দীঘি। দীঘির জলে আলোর প্রতিবিম্ব ভাসছে। সে যেন সেইসব আলোর প্রতিবিম্ব দেখেই মনে করতে পারল, কল্যাণী সারাজীবন এ কোন্ আলোর পিছনে ছুটছে। এতো

তার আত্মহত্যার সামিল। সে বলতে পারত, কল্যাণী তুমি ওকে এখন ফলের রস দাও। অমলকে দেখে মনে হচ্ছে ওর গলা শুকিয়ে উঠেছে। স্বদেশ খুব আপন জনের মত অমলের পাশে বসে বলল, কেমন লাগছে ?

--ভাল লাগছে না স্যার।

- খুব কষ্ট হচ্ছে ?

—স্যার। সে এইটুকু বলে কেমন উদবিগ্ন চোখ নিয়ে তাকিয়ে থাকল।

কিছু বলবে ?

—স্যার, আমি আর বাঁচবো না।

--আরে না না। বাঁচবে না কেন। তুমি একটু ফলের রস খাবে ? কল্যাণী। কল্যাণী। জোরে জোরে সে কল্যাণীকে ডাকল। যেন বলার ইচ্ছা, তুমি এ-ঘরে এস, একটু ফলের রস দাও। ওর চোখ মুখ বড় কাতর দেখাচ্ছে। কিন্তু কল্যাণীর কোন সাড়া পাওয়া গেল না। সে ধীরে ধীরে কল্যাণীর ঘরে ঢুকে গেল। দেখল, কল্যাণী জানালায় দাঁড়িয়ে আছে। দীঘির জলে আলোর প্রতিবিম্ব, যেন বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর, জলের ওপর আলোর প্রতিবিম্ব খোলামকুচির মত ভেঙ্গে গড়ছে, গড়ে ভাঙছে। বুঝি জলে ঢেউ দিল। আকাশের হাজার নক্ষত্র যেন জলে ভাসছে, আবার জল নড়ে উঠলে ঝিলিমিলি—মিলেমিশে সব আবার জল হয়ে যাচ্ছে। নিবিষ্ট মনে কল্যাণী জানালা দিয়ে দীঘির জলে আলোর সেই ভাঙ্গাগড়া দেখছিল এবং এক একটা করে জীবনের সেই সব ছেঁড়া পাতা যেন জলে কেয়া-পাতার নৌকার মত ভাসিয়ে দিচ্ছিল।

সে ডাকল, কল্যাণী !

কল্যাণী জানালা থেকে মুখ তুলে আনল। স্বদেশের দিকে সামান্য তাকিয়ে থেকে বলল, তুমি কেন আস স্বদেশ ? আমাকে কষ্ট দিতে এত তোমার ভাল লাগে কেন ?

স্বদেশ অন্য কথা বলল, অমলের ঘরে যাও। ওকে ফলের রস দাও। ওর গলা শুকিয়ে যাচ্ছে।

কল্যাণী দাঁড়াল না। অমলের গলা শুকিয়ে উঠছে জেনে সে প্রায় ছুটে এল অমলের ঘরে। পাশে বসল। মাথায় হাত বুলিয়ে দিল। একটু ফলের রস দিল খেতে। কেমন ভীত উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছে অমলকে। স্বদেশ সহসা চলে এলেই এমন একটা চেহারা হয় অমলের! যেই স্বদেশ এখানে আসে অথবা যে কোন জায়গায়-- যত যায়গায় গেছে কল্যাণী স্বদেশকে এড়িয়ে বাঁচবে বলে - যত জায়গায় গেছে, দুদিন যেতে না যেতেই স্বদেশ এসে হাজির। যে বার প্রথম পালাল সেবারে স্বদেশের খোঁজ পেতে সময় লেগেছিল, তারপর দেখেছে সে যেখানে গেছে, দু পাঁচ মাস যেতে না যেতেই স্বদেশ খবর পেয়ে গেছে। যেন স্বদেশ ওর পাশেপাশে চর লাগিয়ে রেখেছে—তুমি কল্যাণী যেখানেই যাও, আমি তোমার পেছনে আছি।

অনেক অনুনয় বিনয় এবং ঠিক কেন জানি স্বদেশ জানেনা—সংসারে কি যে হয় কি যে হয় না—স্বদেশ বার বার ছুটে এসেছে কল্যাণীর কাছে। কিন্তু কল্যাণী কোথায় ক্ষমা চেয়ে নেবে, তা না, বার বার এক উপেক্ষা। যত উপেক্ষা তত যেন হেরে যাওয়া জীবনের কাছে। তত স্বদেশ মরিয়া হয়ে উঠেছে। কল্যাণীকে সে এখন নদীর পারের মানুষের মত ভেবে বলল, আমি তোমাদের খবর মিঃ দাসের কাছে পেলাম। তুমি ওর কলেজে কাজ নিয়েছ জেনে আবার এখানে ছুটে এলাম।

এ যেন এক বিষম জ্বালা! কল্যাণী যত পালিয়ে বাঁচতে চায়, যত এক ভাব ভিতরে, প্রাচুর্যে যে মানুষ আছে তাকে আমি ভালোবাসিনা স্বদেশ। অথবা যেন কল্যাণীর মনে হয়, সে এখন ইচ্ছা করলে সব মনে করতে পারে—কল্যাণী স্বদেশের নিকট আশ্রয় চাইলে কল্যাণীর বাবা গুপ্তসাহেব মারমুখো স্বদেশের উপর। স্বদেশের মত বিশ্বাসভাজন মানুষ কল্যাণীকে আশ্রয় দিয়ে বড় অবিশ্বাসের কাজ করে ফেলেছে।

কারণ গুপ্তসাহেবের বড় আশা প্রিয়নাথকে দিয়ে। সে সব পারে। সে এই কোম্পানীর জন্য অর্থাৎ কোম্পানী চালাতে গেলে স্বনামে বেনামে অনেক কিছু করার দরকার হয়—প্রিয়নাথের মত ব্যবসায়ী বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষই গুপ্তসাহেবের দরকার। সুতরাং সুন্দরী কল্যাণী, যার চোখ তেমন বড় নয় অথচ কপাল এবং চিবুক প্রতিমার মতো খুতনীতে বড় একটা তিল, গলায় কোমল স্থলপদ্মের মত চিহ্ন এবং মাঝে মাঝে মনে হয় সেই চোখে, ঘুম থেকে জেগে ওঠার মতো চোখ উদাস, এমন চোখ দেখলে কার না প্রেম করতে ইচ্ছা করে। কল্যাণী যখন সেই উদাসীনতা নিয়ে তাকায়, স্বদেশের মনে হয় কল্যাণী যেন এক হাল্কা নীলরঙের বালিহাঁস, নদীর চরে উড়ে যাবার কেবল বাসনা তার। প্রিয়নাথও এই বালিহাঁসের পেছনে দীর্ঘদিন ছুটেছে। প্রিয়নাথের কূটবুদ্ধি এবং হাতিয়ে নেওয়ার ব্যাপারটা বোধহয় কল্যাণীর পছন্দ হয় নি। স্বদেশ তখন অন্য ধাতের মানুষ। কোম্পানীর সব অর্থব্যয়ের ভার তার ওপর, অথচ জীবন সম্পর্কে বড় উদাসীন এবং সরল অকপট মানুষ। আর এক দঙ্গল মানুষকে যার ভরণপোষণ করতে হয়। বস্তুত স্বদেশকে বড অসহায় মনে হত কল্যাণীর। এমন অসহায় মানুষের জন্য কল্যাণী ভিতরে ভিতরে কষ্ট অনুভব করত। স্বদেশ লম্বা মানুষ। চোখে বড় আত্মপ্রত্যয়ের অভাব। কেবল যেন চলছে চলবে ভাব, অংকের মত স্থির জীবন যাপনে অভ্যস্ত নয়—এমন মানুষের জন্য কল্যাণী স্থির থাকতে পারত না। জোর করে তুলে নেবার সাহস মানুষটার একেবারেই নেই। মাঝে মাঝে সেজন্য সে নিজেকে বড় অসহায় বোধ করত। সুতরাং সে একদিন, প্রায় বলপ্রয়োগের সামিল, ঘরে ঢুকে পাশাপাশি শুয়ে বলল, স্বদেশ আমি তোমার। তুমি আমাকে কোন নদীর পারে নিয়ে চল।

সে কি করে সম্ভব। কল্যাণী সেই ভয় পাওয়া মুখ ইচ্ছা করলে এখনও মনে করতে পারে। কথাবার্তায় স্বদেশ একেবারে অপটু। সে শুধু বলল, তা হয় না। তোমার সঙ্গে প্রিয়নাথের বিয়ে।

গুপ্তসাহেব আমার ওপর তোমাদের যৌতুক কেনার ভার দিয়েছেন। লাল হলুদ নীল রঙের আলো জ্বলবে, গাছে গাছে আলোর চুমকি—বড় লনটায় হাজার লোক একসঙ্গে বসে খেতে পারে এমন সামিয়ানা টাঙ্গানোর ব্যবস্থা করতে হবে, সেখানে একা দাঁড়িয়ে দূর থেকে তোমাকে শুধু দেখব। সব ঠিক, অথচ তুমি এমন কথা বললে আমি যাই কোথা বল।

- কেন, আমার ঘরে যাবে।

—তোমার ঘর আর এখন তোমার থাকছে না।

—তার মানে?

—তুমি ত জানো কল্যাণী তোমার বাবা কত অস্থিরচিত্ত মানুষ। তা ছাড়া তিনি এসব তোমার সহ্য করবেন কেন। বরটি যাবে, ঘরটিও থাকবে না। মাঝখান থেকে আমি বেকার হয়ে পড়ব।

—স্বদেশ! কিছুক্ষণ কল্যাণী সেদিন চুপ করে ছিল। চুল এসে কপালে পড়েছে, দূরে মনুমেণ্টের শীর্ষে কিছু পাখি উড়ে যাচ্ছে। কল্যাণী কপাল থেকে চুল তুলে দিতে দিতে সেসব পাখি দেখল। চোখে মুখে ক্রমে আত্মপ্রত্যয়ের ছবি ভেসে উঠতে উঠতে কেমন সহসা সাহস পেয়ে গেল। বলল, স্বদেশ, আমার হাতে কিছু বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি আছে, তোমার কিছু অভিজ্ঞতা আছে, সুতরাং দুজনে মিলে অনায়াসে কিছু একটা গড়ে তুলতে পারব।

—তা হয়তো পারা যাবে।

—তবে এত ভয় পাচ্ছ কেন?

—কিন্তু আবেগের মাথায় তুমি ভুল করছ না ত। আর একটু ভেবে দ্যাখো না।

—আমি কিছুই আবেগের মাথায় করিনা স্বদেশ। তুমি আমাকে তাহলে এতদিন কি দেখলে।

—আমার প্রতি তোমার এমন দুর্বলতা ছিল ভাবতে অবাক লাগে।

ওরা দুজনেই সেদিন চুপচাপ অনেকক্ষণ মুখোমুখি বসেছিল। জানালা খোলা ছিল বলে উদার আকাশ দেখা যাচ্ছে। পাশে লিফ্‌ট ছিল। লিফ্‌ট থেকে কিছু মানুষ উঠে আসছে, তাদের কোলাহল শোনা যাচ্ছে। সে স্বদেশের পাঁচতলা ফ্ল্যাটে প্রথম এসেছে, সে নিচে উঁকি দিয়ে সমস্ত কলকাতা সহরটা সেদিন দেখার চেষ্টা করেছিল। কত ছোট এই সব মানুষ, আর কত বড় এই আকাশ! নিজের মনে কি যে এক রহস্য, কল্যাণী ধরতে পারছিল না, কেন যে স্বদেশকে এমনভাবে ভালবেসে ফেলেছিল।

—কি, কথা বলছ না কেন? স্বদেশ ফের কথা বলল।

—তোমাকে দেখছি। যেন নতুন করে দেখছি।

স্বদেশ জোরে হেসে উঠল। বলল দ্যাখো, প্রাণভরে দ্যাখো। কিন্তু যাই বলো তুমি কিন্তু বড্ড ছেলেমানুষী করছ।

—করছি, বেশ করছি।

স্বদেশ হাসতে হাসতে বলল, এখন কিন্তু মনেই হয় না তুমি গুপ্তসাহেবের মেয়ে মিস কল্যাণী গুপ্ত। তোমার সুইং ডোরের পাশের বেয়ারাটিকে পর্যন্ত এক সময় আমি সমীহ করতাম। প্রথম প্রথম তোমাকে কোন প্ল্যান এণ্ড প্রোগ্রাম বোঝাতে গেলে তোমার কঠিন মুখ দেখে আমি ঘেমে উঠতাম।

—তুমি একটি কাপুরুষ। বলে কল্যাণী স্বদেশের চুলের ভিতর হাত ঢুকিয়ে মাথাটা ঝাঁকিয়ে দিল, এবং লিফ্‌ট ধরে নিচে নেমে যাবার আগে বলল, বাবাকে আজই কথাটা বলতে হবে। সকাল সকাল আমাদের বাড়ি আসবে।

সেটা মনে হয় কোন উৎসবের দিন। সারা বিকেল সেদিন ওরা কল্যাণীর হিন্দুস্থান ফোরটিনে ঘুরে বেড়িয়েছে। ছোট গাড়ি। কল্যাণী ড্রাইভ করছিল আর কথায় কথায় পাখি, মানুষজন, ভিড়

অথবা ট্রাফিক জাম সম্পর্কে নানা রকমের উক্তি। স্বদেশ বেশী কথা বলছে না। সে হাঁ বা হুঁ এই রকম তুটো একটা শব্দ উচ্চারণ করে যাচ্ছে। গুপ্তসাহেবের একমাত্র মেয়ে কল্যাণী, শাড়িতে মনোরম আতরের গন্ধ। চুলে কি একটা ক্রিম মাখে, অথবা ডাই করার অভ্যাস। চুল কখনও নীল রঙের দেখায়, কখনও কালো রঙের। এমন সুন্দর, মসৃণ চুল কি করে হয় স্বদেশের জানা ছিল না।

বড় গাড়ি কল্যাণীর পছন্দ নয়। গুপ্তসাহেব নিত্য নূতন গাড়ি কিনতেন, কল্যাণী তার প্রিয় হিন্দুস্থান গাড়িতে ঘুরতেই বেশী ভালবাসত। গুপ্তসাহেব যেন এক রাজপুত্রের সন্ধানে ছিলেন। প্রিয়নাথ তার বড় প্রিয়। বড়লোক বন্ধুর ত্রকমাত্র পুত্র, প্রিয়নাথ প্রবাসে দিন কাটাচ্ছিল এবং বিদেশে বড় চাকুরী করত। গুপ্তসাহেব মোটা মাইনে দিয়ে প্রিয়নাথকে নিয়ে এসেছিলেন—কারণ উত্তরাধিকার সূত্রে এই সম্পত্তি সবই তার প্রাপ্য হবে। কিন্তু প্রিয়নাথের প্রতি কল্যাণীর কেমন একটা সব সময়ের জন্য তুচ্ছ তাচ্ছিল্যে বোধ ছিল। প্রিয়নাথকে দেখলে কল্যাণী বড় আড়ষ্ট বোধ করত। এখন সেই কল্যাণী স্বদেশকে পেয়ে বড় জোরে ছুটছে।

স্বদেশ বলল, খুব বেশী জোরে ছুটছে।

—তোমার খারাপ লাগছে?

—এত জোরে ছুটে আমার অভ্যাস নেই কল্যাণী।

তুদিনে স্বদেশ গুপ্তসাহেবের বিষনজরে পড়ে গেল। কল্যাণীকে তিনি সাবধান করে দিলেন। কল্যাণীর অফিস করা বন্ধ হল। প্রিয়নাথকে ডেকে কল্যাণীর সব ফাইলপত্র বুঝিয়ে দিয়ে বলেছিলেন, বড় আতুরে মেয়ে। মানুষ চিনতে ওর সময় লাগে। তু চার দিন স্বদেশের সঙ্গে দেখাশোনার ব্যাপারটা বন্ধ রেখে দিতে পারলে আস্তে আস্তে আবার সব ঠিক হয়ে যাবে।

কিন্তু কল্যাণী, পরম কুলিনের যত মুখ যায়, আহ্লাদে যে মেয়ে সুখী তুঃখী পায়রা ওড়াত আকাশে, পথের যত বেড়াল কুকুর গাড়িতে

তুলে আনত, গাড়ি নষ্ট করত, সুন্দর ফ্রক পরে সেইসব নেড়ি কুত্তার বাচ্চা নিয়ে যে লনে ছুটে আসতে ভালবাসত, সেই মেয়ে যুবতী বয়সে এমন একটা কাজ করবে তার আর বিচিত্র কি। গুপ্তসাহেব কতবার দেখেছেন, শীতে কষ্ট পাচ্ছে একটা কুকুর ছানা, সন্তর্পণে কল্যাণী তাঁর খেলার ঘরে নিয়ে নিজের কোট দিয়ে বাচ্চাটাকে ঢেকে চুপচাপ বসে রয়েছে। কোথায় খুকু, খুকু গেল কোথায়, খুকু তার খেলার ঘরে, মুখে কেমন একটা অপরাধ বোধের চিহ্ন। খুকু তার খেলার ঘরে কুকুরের ছানা প্রতিপালন করছে। এমন মেয়েকে তিনি অফিস যাওয়া বন্ধ করে, স্বদেশের সঙ্গে দেখাশোনার সুযোগ বন্ধ করে জব্দ করতে চেয়েছিলেন। আর অবাক, কল্যাণী সেইসব নেড়ীকুকুর এবং আবর্জনা থেকে সংগ্রহ করা বেড়ালছানার মর্জি ভদ্রমাফিক হলেই কেমন অসংলগ্ন ব্যবহার। সে ওদের প্রতি নজর দিত না, এক প্রকার উদাসীনতা জাগত তখন। সুতরাং গুপ্তসাহেব ভুল করলেন। কল্যাণী বাপকে যতটা ভয় পায় তার চেয়ে বেশী ভালবাসা তাকে আকুল করে। সে একদিন এক কাপড়ে এসে হাজির। স্বদেশ বলল, উপায় ?

কল্যাণী বিছানায় হাত পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়ল, তারপর গলা ছেড়ে গান গাইতে থাকল। প্রাণে দুর্জয় সাহস। কল্যাণী উপুড় হয়ে শুয়ে আছে। হাঁটু পর্যন্ত কাপড় উঠে এসেছে। কল্যাণী কাপড় সামলাল না। সে তার ঘরে বরে পৌঁছে গেছে, সুতরাং নিশ্চিন্ত গলায় বলল, স্বদেশ, আমি যখন আছি তখন ভয় কি ?

স্বদেশের ভারী ইচ্ছা হচ্ছিল চুমু খেতে, কি সুন্দর চিবুক, কি সুন্দর কপাল। কোথায় চুমু খেলে ভারী মিষ্টি লাগবে কল্যাণীকে, কোথায় হাত রাখলে খুব কাছাকাছি থাকা যাবে, এবং কি ভাবে যে আদর করলে কল্যাণীকে আরও প্রিয় মনে হবে স্বদেশ বুঝতে পারছিল না। সে চুপচাপ কল্যাণীর পাশে বসে ছিল, আর শুধু কল্যাণীকে দেখছিল।

—কি, কিছু বলছ না যে ?

—কি বলব বল।

—এই যা খুসী। এমন দিনে কথা না বললে ভাল লাগে না।

—আমায় ভয় করছে কল্যাণী।

—তুমি কি! তোমার এত ভয় কেন? আমি তো আছি।

—তা ঠিক তুমি আছ। তুমি থাকলে ভয় থাকার কথা নয়। সব ছেড়েছুড়ে চলে এসেছ, তোমার ভয় থাকার কথা নয়।

—তবে। আমি আছি, তুমি আছ। আমাদের স্বপ্ন আছে। আমাদের দুজনের উদ্যমে কিছুদিনেই দেখবে সব আবার ঠিকঠাক হয়ে যাবে।

সেদিন কল্যাণী প্রায় পুরুষ মানুষের মত কথা বলছিল। ওর কোন ভয় ছিল না। এখানে থাকবে, খাবে। স্নান করবে। একা এই ছোট ফ্ল্যাটে বেশ চলে যাচ্ছিল স্বদেশের, এখন কল্যাণী এসে যেন সব ফ্ল্যাটটা অধিকার করে নিতে চাইছে। সে নিজেই সেদিন বাজারে গেল, জামা কাপড় কিনে আনল— সব স্বদেশের টাকায়। দিনক্ষণ দেখে ওরা ওয়েলিংটন স্কোয়ারের দিকে হাঁটতে থাকল। ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছিল না। বোধ হয় চৈত্রের কোন কঠিন দিন, পাতাঝরা শেষ হয়ে গেছে। কোন কোন সময় জোর হাওয়া উঠে ঝরাপাতা সব উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে। কিছু সময় ওরা পার্কের ভিতর বসে এসব দেখেছিল।

সুতরাং আবার পরিশ্রম। স্বদেশ সব ক্লায়েন্টদের সঙ্গে দেখা করল। সব খুলে বলল। সে নূতন এক্সপোর্ট ইম্পোর্ট বিজ্‌নেস্ খুলছে। সকলের সহযোগিতা সে কামনা করছে। সব পার্টিদের কাছে প্রায় স্বদেশের কাজকর্ম কিম্বদন্তির মত ছিল। ওর কাজকর্মে আন্তরিকতা, সময় সম্পর্কে নজর, কাজে উৎসাহ আর অমায়িক ব্যবহার প্রতিষ্ঠান গড়ার পক্ষে খুব সাহায্য করল। দিনরাত এই পরিশ্রম— যেন সে কল্যাণীর জন্য জীবন উৎসর্গ করে দিয়েছে। গুপ্ত-সাহেবের মেয়ে কল্যাণী, দাসদাসী, প্রাচুর্য এবং গাড়ি বাড়ি না থাকলে

কল্যাণীর খুব কষ্ট হবে। সে কল্যাণীর জন্য আবার নতুন করে বড় হবার স্বপ্ন দেখতে থাকল।

রাত হয়ে যেত ফিরতে। এসেই সোফাতে গা এলিয়ে দিলে কল্যাণী পাশে এসে বসত। একা ওর কষ্ট হচ্ছে সব দিক সামলাতে। কল্যাণী বলল, ভাবছি আমিও অফিসে বের হব। আমার জন্য তোমার পাশে একটা চেম্বার করে দাও। ব্যাঙ্কের সঙ্গে ক্যাশ ক্রেডিট অ্যারেঞ্জমেণ্ট, ক্লিয়ারিং এজেণ্টদের সঙ্গে যা কিছু যোগাযোগ আমি করছি। বলে পাশে দাঁড়ালে স্বদেশ চোখ দুটো বড় বড় করে দিল, তারপর বলল, গুপ্তসাহেবের মেয়েকে আমি খাটাব ?

—কেন, বাবার অফিসে আমি বসিনি ?

—সেখানে আমাদের মত বহু অধস্তন কর্মচারী বা বলতে পার বান্দা এক কথায় সেলাম ঠুকে হাজির। আমার এখানে এখনও তো তেমন অবস্থা করে উঠতে পারিনি।

—দুজনে মিলে খাটলে করতে বেশী সময় নেবে না। বলে কল্যাণী পাশে বসে স্বদেশের কপাল থেকে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত কিছু চুল সরিয়ে দিয়ে খুব সংলগ্ন হয়ে বসল। জানালা খুলে দিলেই সামনে বড় মাঠ, মনুমেণ্টের শীর্ষে যেন তেমনি পাখি উড়ছে। দূরে হাওড়ার ব্রীজ, এবং নদীর জলে কিছু জাহাজ , মাঠে মাঠে কত লোক, ওদের কত ছোট মনে হয়। রাত হলে সবই অস্পষ্ট। যেন এই কলকাতা শহর কেমন ধীর পায়ে বাড়ি ফিরছে। এত উঁচু থেকে নিচের শহরটা দেখলেই কল্যাণীর কেবল এমন মনে হয়। কি মাস ছিল সেটা, এখন আর স্বদেশের তা মনে আসছে না। তবে শীতকাল ছিল না, শীতকালে কল্যাণী দরজা জানালা প্রায় খুলতেই চায় না। বড় শীতকাতুরে মেয়ে। বোধহয় বর্ষার দিন ছিল, কিন্তু বর্ষা ছিল না। আকাশ পরিষ্কার ছিল খুব। সব নক্ষত্র আকাশে স্পষ্ট ছিল। কল্যাণী জানালার পাশে বসে সংলগ্ন দুই বাহু স্বদেশের বুকে রেখে নক্ষত্র দেখতে দেখতে কেমন অন্যমনস্ক গলায় বলেছিল, তুমি আমাকে চুমু খাবে না স্বদেশ ?

যেন সহসা মনে হল কথাটা। স্বদেশ অফিস থেকে ফিরে এসেই যেখানেই অর্থাৎ যে ঘরেই থাকুক না কেন কল্যাণী খুঁজে পেতে বের করত. তারপর ভয়ঙ্কর এক আলিঙ্গনে আবদ্ধ করত এবং চুমু খেত। আজ স্বদেশ এসেই সোফাতে গা এলিয়ে দিয়েছে, কল্যাণীকে চুমু খায় নি। কল্যাণী দুঃখীত গলায় বলল, তুমি আমাকে চুমু খাবে না স্বদেশ?

—চুমো! কেমন অন্যমনস্ক গলায় কথাটা বলল স্বদেশ।

—আমার মুখ দেখলে তোমার ভাল লাগেনা স্বদেশ। নিশ্চয়ই তুমি এখন কিছু ভাবছ।

—না ভাবলে সংসার চলবে কি করে। তোমার এতবড় আত্মত্যাগ।

তুমি চুমু খাবে না?

—কোনখানে বল।

—যেখানে খুশী।

স্বদেশ পাগলের মত কল্যাণীকে জড়িয়ে ধরে বলল, তোমাকে আমি রাজরাণী করে রাখব কল্যাণী।

বেশ সময় পার হয়ে যাচ্ছিল। দুজনের চেষ্টায় অথবা কর্মফলে বলা চলে এবং পুণ্যফল বলতেও আপত্তি নেই, স্বদেশ চার পাঁচ বছরের ভিতর মোটামুটি স্থির মানুষ অর্থাৎ সে আর তেমন উদাসীন থাকল না। চটপটে এবং কোম্পানীর জন্য সব আয়ব্যয়ের ভিতর যেমন অন্যান্য আর দশটা চোরাগোপ্তা থাকে, সেল সাপ্রেস করা, সেল-ট্যাক্স ফাঁকি দেওয়া, ব্যয়ের হিসাব পরিমাণে বেশী দেখানো—দেখাতে দেখাতে স্বদেশ একদিন যথার্থই স্বার্থপর মানুষ হয়ে গেল। নেড়ীকুকুর বেড়ালছানা বড় করতে করতে অথবা হাঁটি হাঁটি পা পা করলে যেমন কল্যাণীর একসময়ে উদাসীনতা জাগত, স্বদেশের প্রতি কল্যাণীর তেমন উদাসীনতা জাগল। স্বদেশকে একদিন স্বার্থপর এবং দুষ্ট বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ বলে মনে হল কল্যাণীর। মানুষটার প্রতি সেই

এক মানুষ যেমন প্রিয়নাথ ছলে বলে বাবাকে হাত করতে চেয়েছিল, কল্যাণীকে পাবার জন্য ছলাকলার জাল বিস্তার করেছিল, ঠিক তেমনি এই মানুষ স্বদেশ বড়লোক হবার জন্য কি জঘন্য সব কাজ, ভাবলে এখন কল্যাণীর গা শিউরে উঠতে থাকে। এই স্বদেশ একসময় কল্যাণীর প্রিয়নাথ হয়ে গেল। শুধু টাকা টাকা, টাকার চামার। আর এই সময়ে এল অমল। ডেসপাস সেকসানে নতুন নিয়োগ। কল্যাণীর ইন্টারভিউতে সে হাইয়েস্ট মার্ক পেল। অমল ভালো এবং কাজকর্ম সম্পর্কে আন্তরিক। কেবল সেই উদাসীনতা নিজের সম্পর্কে। স্বদেশ গুপ্তসাহেবের কোম্পানীতে যেমন উদাসীনতা নিয়ে কাজ করত, তেমন উদাসীনতা অমলের ভিতর লক্ষ্য করল। কথা নেই বার্তা নেই কল্যাণী এক রাতে অমলকে ওদের সঙ্গে খেতে বলে দিল।

—তুমি এটা কি করলে কল্যাণী। স্বদেশকে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ দেখাল।

—কেন, কি করেছি।

—ওকে নেমতন্ন করে খাওয়ালে সকলকে করতে হয়। তোমার কাছে সবাই সমান ব্যবহার পাবে আশা রাখে। তুমি কাউকে কিছু স্পেশাল করলে··· ।

কল্যাণী স্বদেশকে কথা শেষ করতে দিল না। বলল, ব্যক্তিগত পছন্দ অপছন্দ সব জায়গায় থাকে স্বদেশ।

—কিন্তু ভুলে যাবেনা ওরা তোমার কর্মচারী।

কল্যাণী হাসল, হাসিটার ভিতর যেন বড় উপেক্ষা কাজ করছে। সে বলল, অমল ঠিক তোমার মত স্বদেশ। ছেলেটা সারাদিন কি খাটে দেখেছ। আমার খারাপ লাগে। আমি একদিন ডেকে বললাম, কে কে আছে তোমার ?

—কি বলল ?

—বলল, নিজের বলতে কেউ নেই। এক বড় বিধবা বোন

আছে। তার পাঁচ সাতটি ছেলেমেয়ে। তাদের সে বড় করছে। তাদের কোন কষ্ট হোক সে চায় না।

—তাই বুঝি।

—আমার ভারি অবাক লাগল।

—অবাকের কি আছে!

—অবাক লাগবেনা? তুমি বল, কেউ আজকাল আর রক্ত জল করা টাকা দিয়ে বিধবা বোনের ছেলে পিলে বড় করে?

—তুমি দেখছি তবে অমল সম্পর্কে ভেবে খুব কষ্ট পাচ্ছ।

বোধহয় কল্যাণী স্বদেশের খোঁচাটা ধরতে পেরেছে। ধরতে পেরে চুপ করে গেল। কোন উত্তর করল না। কল্যাণী গম্ভীর থাকলে স্বদেশের কেমন মনে হয় ওর সব উদ্যম বিফলে গেল। সে বলল, বেশ, না হয় অমলকে খাওয়াচ্ছ খাওয়াও, কিন্তু ওদের সঙ্গে যে কজন তোমার অন্য কর্মচারী আছে তাদেরও বলে দাও।

—হঠাৎ সকলকে খাওয়াবার কারণ দেখাতে হয়।

—কারণ আবার কি! আমাদের বিবাহবার্ষিকী।

—কি যা তা বলছ। বিবাহবার্ষিকীর দিনটা বছরে দুবার আসে?

—সেটা অবশ্য কথা! তারপর কি ভেবে বলল কে আর হিসেব রাখছে। আর যদি তা না বলতে চাও, বলবে তুমি গত রাতে স্বপ্ন দেখেছ, অফিসের সকলকে খাওয়াচ্ছ—তাই একটা ভোজ দিয়ে দিলে।

—রাখ তোমার স্বপ্ন। স্বপ্ন দেখে কেউ আজকাল খাওয়ায় নাকি!

স্বদেশ কেমন একটা সমস্যার ভিতর পড়ে গেল। -শোন তবে, ওদের বলি যে আমরা এ দিনটিতেই ব্যবসা করব বলে মনস্থ করেছিলাম। সেই উপলক্ষে ভোজ।

কল্যাণীর এখন আর এ ব্যাপারে উৎসাহ দেখা যাচ্ছে না। সে বলল, যা খুশী কর।

কিন্তু কল্যাণী মনে মনে যা একবার স্থির করে ফেলে তা থেকে কিছুতেই নড়তে চায়না। কোথায় যেন স্বদেশ ওকে অপমান করেছে। কি আছে এর ভিতর, অমল ওদের সঙ্গে বসে একদিন বাড়িতে খাবে, কি আছে এতে। অমলের বয়স কম, এই পঁচিশ ত্রিশ হবে। কল্যাণীর চেয়ে ছোটই হবে, কি মার্জিত চেহারা অমলের। কথা খুব আস্তে বলে। ভীতু মনে হয়। চোখ তুলে বড় কথা বলে না। কাজের ভার দিলে সে যত কঠিন কাজই হোক না, কাজে আন্তরিকতার শেষ নেই। চুপচাপ নিজের কাজটি করে যখন বের হত তখন অমলকে বড় ছেলেমানুষ মনে হত। একদিন কল্যাণী অমলকে ডেকে বলেছিল, তুমি অফিসে কি টিফিন কর?

অমল সামান্য টিফিনের যা ফিরিস্তি দিল তাতে কল্যাণীর রাগটা যেন বেড়ে গেল স্বদেশের ওপর। কল্যাণী বলল স্বদেশকে, অমল আমার কাছে এসেছিল, ওর ত কাজ অনেকদিন হয়ে গেছে। ফিনান্স কর্পোরেশন থেকে সে যে কৃতিত্বের সঙ্গে টাকাটা আদায় করেছে তার জন্য ওর কিছু ইনক্রিমেণ্ট হওয়া দরকার।

স্বদেশ বলল, যদি দিতে চাও দেবে। কিন্তু তুমি শান্তি পাবে না। তুমি ইচ্ছাকৃত ভাবে একটা বিরোধ সৃষ্টি করবে অফিসে।

--বিরোধ কেন?

—বিরোধ না? ওরা সকলেই কাজ করছে, ওদের ইউনিয়ন নেই। কিন্তু মনে রেখো কারো প্রতি কোন স্পেশাল ফেভার দেখালেই অন্যরা চটে যাবে। তখন তোমার কাজকর্মে অনেক অসুবিধা দেখা দেবে, ঠেলাঠেলির দায় হবে। কেউ আর মনপ্রাণ দিয়ে কাজ করবে না।

—এটা কি তোমার অফিস না তাদের অফিস।

—আমার অফিস।

--তবে। তোমার ইচ্ছা অনিচ্ছার কোন দাম নেই? তোমার ভাল লাগা মন্দ লাগার কোন দাম নেই?

—দাম থাকবে না কেন। ইচ্ছা করলে সবই করতে পার।

কিন্তু এর পর কি এফেক্ট হতে পারে আগে থেকেই ভেবে রাখা ভাল।

কল্যাণী বলল, তুমি এখনও সেই ভীতু মানুষই আছ স্বদেশ। কল্যাণীর বলার ইচ্ছা ছিল, স্বদেশ তুমি সেই কাপুরুষই রয়ে গেছ। আগে ছিলে গুপ্তসাহেবের কাছে, এখন অফিস কর্মচারীদের কাছে। তার পর কি ভেবে যেন নিজেই ঠোঁট উল্টে দিল। না, তা নয় যেন, ওর সব কাজে এখন দোষ ধরার একটা বাতিক এসে গেছে স্বদেশের। ওকে ছোট করার একটা স্বভাব জন্মে গেছে স্বদেশের। ওর মতামতের কোন মর্যাদা দিচ্ছে না স্বদেশ। বস্তুত স্বদেশকে বড় চতুর এবং স্বার্থপর মানুষ মনে হল। যার যা প্রাপ্য তাকে সে তা দিচ্ছে না। স্বদেশের এখন মানুষ ঠকানো স্বভাব।

এবার কল্যাণী স্বদেশের সব দিকটা কেমন পরিষ্কার দেখতে পেল। ছয়কে নয় করা নিয়ে অমল একদিন কল্যাণীর কাছে এসে হাতজোড় করে বলল, আমি কাজ ছেড়ে দিচ্ছি।

—কেন, কাজ ছেড়ে দেবে কেন!

– এই দেখুন। বলে অমল প্রায় নালিশ দেবার মত করে বলল, এত টাকা ম্যানুপুলেট করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। এর যেকোন ভাউচারে সই ধরা পড়লে আমার জেল হতে পারে।

—তুমি সব এখানে রেখে যাও।

অমল কাগজপত্র সব রেখে গেলে সে টেবিলটার দিকে কিছুক্ষণ অপলক তাকিয়ে থাকল। সব পারচেজ ডাবল করা হচ্ছে। ষ্টক স্টেটমেণ্ট নূতন করে লিখতে হবে। গোটা একাউন্ট বদলে দেওয়া হচ্ছে। স্বদেশ এক্সপোর্ট ইম্পোর্ট বিজ্‌নেস করতে করতে লাভের অঙ্ক বাড়িয়ে একটা বড প্লাষ্টিকের ফ্যাক্টরী করে ফেলেছে। টিনের ফ্যাক্টরী। লাভের অঙ্ক এত বেশী যে গোটা টাকাটার অর্দ্ধেকটাই সরকার নিয়ে নেবে। কল্যাণী খাতাপত্র তুলে রাখতে বলল বেয়ারাকে। সরকারের হাতে যাতে একটা টাকাও না পৌছায় সেজন্য কি

বেলেল্লাপনা স্বদেশের। অমলকে দিয়ে সে এমন সব কাজ করিয়ে নিতে চায়। অমলকে সে হাতে পায়ে শেকল পরাতে চায়। কি ভেবেছে স্বদেশ! সে আজ যা হয় কিছু বলবে। অন্যদিন অফিস শেষ হলে স্বদেশ কল্যাণীর ঘরে আসে, তারপর দুজনে বের হয়ে যায়। স্বদেশের অন্যকোন বদ অভ্যাস গড়ে ওঠেনি। কিছুক্ষণ মাঠে হাওয়া খেয়ে, কিছু সময় নদীর পারে দাঁড়িয়ে হাওয়া খেতে খেতে যেন অফিসের ক্লান্তি দূর করার বাসনা। অথবা একসঙ্গে কোন ভাল থিয়েটারে অথবা কোন কোন সময় দুজনে হিন্দুস্থান পার্কের তিনতলার ঘরটাতে বসে রেকর্ডে রবীন্দ্রসংগীত শোনে—এমন ভাবেই যখন দিন কেটে যাচ্ছিল তখন কিনা আজকের মত দিনটাতে কল্যাণী একা গাড়িতে বের হয়ে গেল। পাশের ঘরে স্বদেশ বসে রয়েছে। সে ইচ্ছা করেই বলল না বেয়ারাকে, বাবুজীকে সেলাম দাও। ভিতরে ভিতরে কল্যাণী কেবল অপমানিত হচ্ছে। অমলকে ছোট করার ভিতর যেন ওকেও ছোট করার একটা বাসনা রয়েছে স্বদেশের। কল্যাণী গাড়ি চালাতে চালাতে বলল, স্বদেশ আমায় একটা ছোট খেলাঘর দিল, আমার কেন জানিনা অসহায় মানুষ দেখলে বড় করুণা হত। ঠিক --তুমি কোনদিন উৎসবমুখর বাড়ির প্রাঙ্গণ পার হয়ে নির্জন রাস্তায় পড়ে, যদি সেখানে অন্ধকারের ভিতর শুনতে পাও একটা বিড়ালছানা কোথাও ডাকছে, পথ খুঁজে পাচ্ছেনা, ভয় পাচ্ছে, তখন তাকে রক্ষা করতে না পারলে শান্তি পাবে না স্বদেশ। তুমি অমলকে ক্রমশ কেবল অন্ধকারে ঠেলে দিচ্ছ। আমি কেবল সেই এক অসহায় বেড়ালছানা জীবনভর খুঁজে বেড়াচ্ছি। অন্ধকার থেকে তুলে আনা আমার কেমন একটা স্বভাব। সে সোজা অফিস থেকে বের হবার মুখে মনে মনে এমন সব ভেবে ফেলল। সে সোজা বাড়ি ফিরে এসে খুব সাজল। সুন্দর করে, যেমন সে বিয়ের আগে শাড়িতে নানা রকমের ক্লিপ এঁটে শরীরটাকে দর্শনীয় করে তুলত। যেন সব সময় ফ্যাশন শোতে প্যারেড করতে যাচ্ছে কল্যাণী- কারণ এই পোশাক

সে দেখেছে স্বদেশের খুবই প্রিয়। স্বদেশের অন্য বাস্তিক গড়ে ওঠেনি যেন তার এই এক কারণ— কারণ এই কল্যাণী এত সুন্দর করে সাজতে পারে, কথা বলতে পারে, এই কল্যাণীকে না হলে যেন তার কোনদিন চলবে না। সেজন্য সামান্য উদাসীনতা কল্যাণীর ভিতর আবিষ্কার করে স্বদেশ মনে মনে হিংস্র হয়ে উঠেছিল।

স্বদেশ ফিরে এসেই দেখল কল্যাণী তার প্রিয় রেকর্ডটা বাজিয়ে গান শুনছে। সে একা একা চলে এসেছে কেন জিজ্ঞাসা করতে পারত, কিন্তু গানের ভিতর মন ডুবে আছে, সুতরাং ডিষ্টার্ব করা ঠিক না, সারাদিন পরিশ্রমের পর একটু আনন্দ করবে, সাজবে আর মুখে একটু রঙ মেখে বয় বাবুর্চির হাতে রান্না খাবে —এই ত নিয়ম। সে যেমন অন্যদিন নিজের ঘরে ঢুকে সোফাতে বসে প্রথমে দুহাত পা ছড়িয়ে সামান্য সময় বিশ্রাম নেয়, আজও তেমনি বিশ্রাম নিল। অন্য ঘরে তেমনি রেকর্ড বাজছে —আকাশ পারে, কি যেন এক আকাশ, কবির কল্পনাতে সেই আকাশ কত বড়, তার আকাশ ক্রমে এত ছোট হয়ে আসছে কেন, সামান্য নিমন্ত্রণের ব্যাপারটা এমন ভাবে সে দেখল কেন, অমল সম্পর্কে এত দ্বিধা কেন! যত অমল সম্পর্কে কল্যাণী বেশী ইণ্টারেষ্ট নিচ্ছে তত সে অমলকে বিব্রত করতে ভালবাসছে কেন। সামান্য এক অমল ওর প্রতিদ্বন্দ্বী হয় গেল!

স্বদেশ এবং কল্যাণী একসঙ্গে ফিরে এলে অন্যদিন কল্যাণী নিজেই তাড়াতাড়ি কাপড় ছেড়ে প্যানট্রিতে ঢুকে যায়। ততক্ষণে স্বদেশ হাত মুখ ধুয়ে মুখ মুছে ভালোমানুষের মত জানালা খুলে বসে থাকে। ক্লাবে যাবার স্বভাব এক সময় ছিল, কিন্তু এখন কাজের চাপ এত বেশী যে ক্লাবে যাবার কথা ভুলে যেতে হচ্ছে। বরং কল্যাণী এক হাতে এক কাপ চা, দুটো সন্দেস এনে রাখবে টিপয়ে, নিজের জন্য শুধু এক কাপ চা, নিজে কিছুতেই ভালমন্দ খেতে চাইবে না, সব যেন এই কল্যাণী

স্বদেশের জন্য করে যেতে চাইছে, আর এখন কল্যাণী শুধু গান শুনছে —আকাশ পারে…। সে যে মুখ ধুয়ে কখন থেকে বসে আছে তা পর্যন্ত টের পাচ্ছে না। পায়চারী করে দরজার সামনে দিয়ে হেঁটে যাবার ইচ্ছে, কল্যাণী দেখুক স্বদেশের হাত মুখ ধোওয়া হয়ে গেছে, বয় দরজায় অপেক্ষা করছে, মায়জী এলেই সে পিছনে পিছনে যাবে।

কিন্তু কল্যাণী এত বিমর্ষ কেন! সে জানালা খুলে এখন দূরের মাঠ দেখছে। মনেই হয়না এই বাড়ির ভিতর তার প্রিয়জন বলে কেউ আছে। কি এক করুণ বিষণ্ণতা, কোন এক সাগরপারে তার প্রিয়জনকে বুঝি রেখে এসেছে। জানালায় ঝুঁকে রয়েছে কল্যাণী, বসন্তের হাওয়া চলে এসে সেই হাওয়া লাগছে। পার্কের গাছগুলো এবং মাঠের বড় বড় গাছে পাতা ঝরতে আরম্ভ করেছে। সন্ধ্যায় এখন চারিদিকে লাল নীল আলো জ্বলে উঠছে। গাড়ির শব্দ আর মনে থেকে থেকে কে যেন হেঁকে উঠছে আমরা ভিতরে ভিতরে কেবল নতুন স্বপ্ন দেখি।

স্বদেশ দরজায় দাঁড়িয়েছিল। কল্যাণীর ঘাড় এবং পিঠ সে দেখতে পাচ্ছে। কি মসৃণ ঘাড়, এবং কল্যাণীর পিঠের কিছু অংশ মোমের মত সাদা দেখাচ্ছিল। কাপড়ের ভাঁজটা এই সন্ধ্যায় সহসা ওকে কেমন কাতর করল। কোথায় সে রাগে দুঃখে কল্যাণীকে ভৎর্সনা করবে ভাবছে, কল্যাণীকে শাসাবে ভাবছে--কিন্তু মনোরম সন্ধ্যা এবং জানালায় ঝুঁকে থাকা কল্যাণীর রমণীয় পিঠ আর পায়ের ভাঁজ-টুকু ওকে পাগল করে দিল। সে দরজার এদিকটাতে এলে বয় বেয়ারা কেউ আসেনা, আসার নিয়ম নেই। সে ঘরে ঢুকে প্রথম রেকর্ড পাল্টাল, যে গান স্বদেশ এবং কল্যাণীর উভয়ের প্রিয় তেমন একটা রেকর্ড বাজাল। স্বদেশ, যেমন অন্যদিন রাতের পোশাক পরে, এবং লম্বা সিল্কের গাউন—পা পর্যন্ত লুটোতে থাকে, আজও তেমনি লম্বা গাউনে স্বদেশকে খুব লম্বা মনে হচ্ছিল। চুরুটের গন্ধ কল্যাণী সহ্য করতে পারবে না বলে সন্ধ্যার পর থেকে সে পাইপ টানে এবং নরম

টোবাকোর—যাতে মনোরম গন্ধ থাকে, সুন্দর সুমিষ্ট গন্ধ—কারণ কল্যাণীর খুব প্রিয় একটা টোবাকো আছে, যা টানলে কল্যাণী একেবারে পাগলের মত খুশীতে নাচতে থাকে। সে সেই সব মনোরম টোবাকো পাইপে পুরে বসে গান শুনতে লাগল, এবং পাইপ টানতে থাকল। মনে মনে যে স্বদেশ প্রতিজ্ঞা করেছে কল্যাণীর অভিমান যে করেই হোক ভাঙ্গাতে হবে, বস্তুত কল্যাণী রাগ করলে স্বদেশ কাজকর্মে একেবারে উৎসাহ পায় না। বড় অসহায় মনে হয় নিজেকে। অথচ মনের ভিতর কি যেন এক সন্দিগ্ধ মন আছে সন্দেহ অমল সম্পর্কে—বুঝি সে নিজে ক্রমে গুপ্তসাহেব হয়ে যাচ্ছে -কড়া মেজাজের মানুষকে সকলে বাঘের মত ভয় পায়, কল্যাণী কোন বেয়াদপী করলে ফার্মের যেন সুনাম নষ্ট হবে, সে কল্যাণীকে অমঙ্গল থেকে রক্ষা করে ফার্মের সুনাম রক্ষা করছে।

গান শেষ হল, আর একটা রেকর্ড পাল্টাল স্বদেশ। কিন্তু কল্যাণী সেই যে জানালায় ঝুকে আছে, কিছুতেই এসে সামনা-সামনি বসছে না। স্বদেশ ভাবল, একবার ডাকবে, কল্যাণী। কল্যাণী দেখো, দেয়ালে তোমার সেই প্রিয় ছবিটার মুখে কি সরল অনাড়ম্বর হাসি। ছাখো তুমি কি ছেলেমানুষ এখনও। সামান্য ব্যাপার নিয়ে তুমি এখন মুখ গোমড়া করে রাখলে ভাল লাগে না। কল্যাণী তোমার পা কি সুন্দর। আলতা পরলে মনে হয় তুমি লক্ষ্মীর মত ঘরে ছায়া ফেলে যাবে—তুমি কল্যাণী এ-সব বোঝ না কেন, কোথাকার কে এক অমল, তুমি ওর সুখ দুঃখ নিয়ে ভাবছ। সংসারে এমন কত অমল আছে, একদিন তোমাকে আমি আমার সেই আগের মেসে নিয়ে যাব। তখন আমি গুপ্তসাবের কাছে কাজ পাই নি। ছোট্ট এক সওদাগরী অফিসে সামান্য মাইনের কেরাণী। মেসে আমরা খুব কম বেতনে কজন মানুষ দুঃখে-কষ্টে দিন যাপন করতাম। একবার ইচ্ছা হয় সেখানে যেতে—ওরা কিভাবে বাঁচছে আমার দেখতে ইচ্ছা হয়। তুমি গেলে দেখতে পাবে, তোমার অমলের মত সব মানুষ সেই সব মেসে কত

সহজ ভাবে জীবনটা কাটিয়ে দিচ্ছে। তুমি তাদের যত দুঃখ আছে মনে করছ, বস্তুত তত দুঃখ নেই। আদৌ আছে কিনা আমার সন্দেহ আছে।

স্বদেশ কিছুতেই কল্যাণীকে জানালা থেকে তুলে আনতে পরল না। সে রেকর্ড পাল্টাল - একটা গান আছে, গানটা ইংরাজী—উই আর ইন দি সেম বোট, এবং গানটা কোন কোন দিন গভীর রাতে বাজিয়েছে। কল্যাণীকে বুকের কাছে নিয়ে, কপাল থেকে কল্যাণীর চুল সরিয়ে দিতে দিতে, কখনও চুমু খেতে খেতে অথবা কখনও অন্য কি যেন খোঁজার সময় মনে হয়েছে গানটা ভেলার মত ওদের দুজনকে অনেক দূর নিয়ে যাচ্ছে—নির্জন কোন দ্বীপে, কল্যাণীর চোখ আবেশে বুঁজে আসছে, সুন্দর স্বপ্ন দেখছে যেন কল্যাণী। অথবা তখন কল্যাণীর মুখ দেখলে মনে হত, কল্যাণী ক্রমাগত জলের গভীরে মুক্তো অন্বেষণে ডুবে যাচ্ছে, ডুবে যাচ্ছে। কল্যাণীর শরীর ক্রমে শক্ত হয়ে আসত, কেবল মনে হচ্ছে ডুবে যাচ্ছে ডুবে যাচ্ছে কোথাও। ডুবে গিয়ে সেই শিশির বিন্দুটির মত মুক্তো—অজস্র মুক্তো তুলে নিতে নিতে কল্যাণী কেমন অবশ হয়ে যেত। স্বদেশ ওকে আকর্ষণ করার জন্য শেষবারের মত সেই রেকর্ডটা ঘুরিয়ে দিল।

কল্যাণী কোন আগ্রহ প্রকাশ করল না। এমন কি স্বদেশ যে এ ঘরে ঢুকেছে তা পর্যন্ত ঘাড় ফিরিয়ে দেখল না। সে যেন ঠিক বাপের মতো। গুপ্তসাহেব মেয়ের মুখ আর কিছুতেই দেখলেন না। এত প্রতিপত্তি স্বদেশের তবু তিনি একবার ওদের আশীর্বাদ করতে আসেন নি। কতবার স্বদেশ কল্যাণীকে বলেছে, চল একবার যাই। ওর অভিমান ভেঙ্গে যাবে। কল্যাণী বলেছে তখন, বাবা আমাকে ত্যাগ করেছেন। আমি আর যাচ্ছি না। এতবড় সম্পত্তি হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে। স্বদেশ মাঝে মাঝে কল্যাণীর ওপর বিরক্ত হয়ে পড়ত, এমন একগুঁয়ে মেয়ে, কে কোথায় কবে দেখেছে। সে জানে একবার সামনে গিয়ে দাঁড়ালেই গুপ্তসাহেবের রাগ ভেঙ্গে যাবে,

গুপ্তসাহেব মেয়েকে বুকে জড়িয়ে ধরবেন, এবং এত বড় সম্পত্তি তবে কিছুতেই আর হাতছাড়া হবে না। কারণ সে শুনেছে, তিনি নাকি তার এত বড় সম্পত্তির জন্য দানপত্র করছেন। আজকাল অফিস টফিস করেন না। যা কিছু আয় সব কোন এক সংঘের নামে লেখাপড়া করে দিচ্ছেন। কিন্তু কল্যাণীকে কিছুতেই রাজী করানো গেল না। সে একদিন খোলাখুলি বলল, তুমি যদি এখনও না যাও তবে তোমার বাবা সব দানপত্র করে দেবেন।

—দেবেন ত আমার কি!

—বারে, তোমার সম্পত্তি অন্যে ভোগ করবে?

—আমার সম্পত্তি হবে কেন। বাবা ত আমাকে ত্যাগ করেছেন।

—তোমার ছেলেমানুষী রাখো কল্যাণী। তুমি কি কিচ্ছু বোঝ না। আদরে আদরে আর মাথাটা তোমার ঠিক নেই।

—কে বলছে ঠিক নেই। বরং স্বদেশ তোমার মাথাটা ঠিক নেই। তুমি বড় ধূর্ত—একথা বলতে পারত। কিন্তু না বলে বলল, অন্যের সম্পত্তিতে এত বেশী লোভ কেন। বাবা নিজে তার সম্পত্তি গড়েছেন। পৈতৃক সম্পত্তি তিনি কিছু পাননি। এখন যদি তিনি তার খুশি মত কিছু করেন, তুমি তার জন্য কিছু বলতে পার না।

স্বদেশ এমন মেয়েকে আর কি বলবে। ছেলেমানুষের মত কথা। নিজের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে এতটুকু ভাবে না। বরং এই যে এত প্রাচুর্য, এত বেশী সুখ—কল্যাণীর এই সুখ কেন জানি সহ্য হচ্ছে না। উটকো সব ঝামেলা সে নিজেই তৈরী করে নেয়। না নিলে যেন সে মনে মনে সুখ পায় না। কল্যাণী অমলকে নিয়ে ফের তেমন একটি উটকো ঝামেলা বাধাতে চাইছে। স্বদেশ ফের কি ভেবে অন্যমনস্ক ভাবে টোবাকোতে আগুন দিল। কল্যাণীর শরীর, ঘাড়, গলা এবং ভাঁজকরা ভঙ্গীটুকু দেখে সে অধীর হয়ে পড়ল। সে বসে থাকতে পারল না। কল্যাণীর পাশে গিয়ে দাঁড়াল। ব্যালকনি থেকে সে নিচের পথ দেখার ভান করে প্রথম যেন অফিসে কিছুই হয়নি এমন

ভাবে বলল, দ্যাখো কল্যাণী, কি সুন্দর ফুটফুটে ছেলেটা মাঠে দৌড়াচ্ছে।

কল্যাণী জবাব দিল না।

—কে আছে ছেলেটার পাশে। কাউকে ত দেখছি না। ওর আয়াটা গেল কোথায়। দেখছ কেমন ছুটে বড় রাস্তার দিকে যাচ্ছে?

কল্যাণী চোখ বুজে থাকল।

—এই রে গাড়ি চাপা পড়বে।

কল্যাণী বলল, এরা কখনও গাড়ি চাপা পড়ে না স্বদেশ। এদের জন্য সকলের চোখ খোলা। তুমি এখান থেকে দেখছ, নিচে যারা হাঁটছে তারাও দেখছে। ওকে বড় রাস্তা পর্যন্ত কেউ যেতেই দেবে না। আগেই ধরে ফেলবে।

যা হোক সে কল্যাণীকে কথা বলাতে পেরেছে। সে এবার বলল, মিঃ চোপরা একদিন ওর কারখানা দেখে আসতে বলছে, যাবে নাকি?

কল্যাণী বলল, ওর যেন কিসের কারখানা?

—ও একটা কেমিকেলের কারখানা খুলেছে। ও যদি ভাল করে চালাতে পারে, তবে তোমার একটা বড় পার্টি হয়ে যাবে। দিল্লীর উদ্যোগ ভবনে ওর খুব দহরম মহরম আছে।

কল্যাণীর এসব কথা ভাল লাগছিল না। আবার সেই এক টাকার স্বপ্ন। স্বদেশ এখন উদ্যোগ ভবনে নিশ্চই কোন ব্যক্তিকে ধরার তালে আছে। ধরতে পারলেই কাজ হাসিল। সে জানে হয়তো অমলকে দিয়েই সে এ সব কাজ করাবে। ঘুষের টাকা এবং ভালভাবে ঘুষ দিতে পারলে বড় রকমের লাইসেন্স মিলে যাবে। কোন ঝামেলা নেই। ফলস্ কনজামপসান দেখিয়ে টাকাটা বের করে নেওয়া। অমল খুব বুদ্ধিমান ছেলে। সে অনায়াসে এ-সব কাজ স্বদেশের হয়ে করে দেবে। কিন্তু মনে মনে ভাবল, সে অমলকে একাজ করতে দেবে না। খুব নোংরা কাজ। ওর জানা আছে সব। এমনকি এ-সব কাজে নানারকম কৌশলের দরকার হয়। এবার স্বদেশ কি ভেবে রেখেছে কে

জানে। টাকার জন্য এখন স্বদেশ না করতে পারে হেন কাজ নেই।

কল্যাণী বলল, তুমি কাকে এ কাজের ভার দেবে ভাবছ।

—অমলকে দেব। ওকে আমি গড়ে নিতে চাই। খুব সৎ এবং সিনসিয়ার। আর কাউকে দিয়ে বিশ্বাস করা যায় না।

বিশ্বাস করা যায় বলে ওর আখেরটি নষ্ট করে দিচ্ছে। মনে মনে কল্যাণী এমন ভাবল। তারপর ভাবল, আমি কল্যাণী, তুমি অনেক কিছু করে যাচ্ছ, তুমি এমন সব কাজ করে যাচ্ছ, কি বলব স্বদেশ—আমি কেন জানি কোন সুচতুর অথবা বলতে পার স্বার্থপর মানুষ দেখলে ভিতরে ভিতরে বড় কষ্ট পাই। তুমি ওকে দিয়ে ক্রমে আরও খারাপ কাজ করাবে। আমার সামান্য সহানুভূতি ওর প্রতি তোমাকে এমন একগুঁয়ে করে তুলছে।

স্বদেশ কল্যাণীকে কিছুতেই খুশী করতে পারল না। ভাবল সে, অমলকে যখন এত বড় একটা কাজের দায়ীত্ব দিচ্ছে, কল্যাণী নিশ্চয়ই খুশী হবে। স্বদেশ ঘরের নীল আলোটা নিজেই জ্বেলে দিল। এটা এমন এক ঘর, যেখানে কেউ বেল না টিপলে আসে না। অন্ধকার ঘরের ভিতর শুধু ঘড়ির টিক টিক শব্দ শোনা যাচ্ছিল। স্বদেশ নীল আলোটা জ্বেলে দিয়ে কল্যাণীর কাছে গিয়ে পিঠের ওপর হাত রাখল, বলল, আমি যে এত সব করছি সে কার জন্য?

কল্যাণী এবার তিক্ত গলায় বলল, আমার জন্য কিন্তু তোমাকে এত নিচে নামতে বলিনি স্বদেশ। তুমিত সোজা কথায় যাকে বলে চুরি আরম্ভ করেছ।

—কোথায় চুরি করছি!

—এগুলো চুরি না? তুমি খাতাকে খাতা পাল্টে দিচ্ছ। যা প্রকৃত তাই তুমি গোপন করছ!

—কল্যাণী তোমাকে কি করে বোঝাব। তোমার বাবা গুপ্ত-সাহেবও এ সব করেছেন।

—বাবার নামে অযথা মিথ্যা অপবাদ দিও না।

—আরে, এসব না করলে এক জীবনে গাড়ি বাড়ি করা যায় না, ব্যবসা বড় হয় না সংসারে প্রাচুর্য আসে না।

তুমি শেষ পর্যন্ত চুরি করে আমাকে সুখে রাখছ স্বদেশ। এটা ঠিক না। আমি জানি স্বদেশ তুমি সব তোমার নিজের জন্য করছ। ক্রমে তোমার লোভ বাড়ছে। ক্রমে তুমি যক্ষের মত প্রাচুর্যের ভিতর বসবাস করতে চাইছ। যত প্রাচুর্য বাড়ছে তত মনে হচ্ছে তোমার আরও দরকার। তুমি নিরীহ মানুষদের এনে তোমার আয়ের জন্য তাদের তোমার ইচ্ছার কাছে উৎসর্গ করছ। আমি সব বুঝি স্বদেশ আমি তোমাকে চিনে ফেলেছি।

সে রাতে স্বদেশ কল্যাণীকে নানাভাবে উত্তেজিত করতে চেয়েছিল। পারেনি। স্বদেশ কল্যাণীর সারারাতের এই ঠাণ্ডা ভাব, সারারাত কল্যাণীর শক্ত হয়ে পড়ে থাকা, যখনই কাছে যাওয়ার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করেছে, মনে হয়েছে কল্যাণীকে, মৃতপ্রায় যেন। কোনো সাড়া শব্দ সে পায়নি।

পরদিন ভোরে স্বদেশ বলল, কল্যাণী তুমি বরং অফিসে যাওয়া বন্ধ করে দাও।

- তার মানে!

তার মানে তুমি আমার ব্যবসাটা, এত কষ্টে যা গড়ে তুললাম, দিনরাত পরিশ্রম করে যা গড়োছি, তুমি তা নিয়ে ছেলেমানুষের মত খেলা করতে চাও।

কল্যাণী কি বুঝে শুধু বলল -তা হবে।

—হবে না কল্যাণী, হচ্ছে। কারণ স্বদেশ দেখলো, কল্যাণী ঝেড়ে কাশছে না। স্বদেশের কোথায় যেন মাঝে মাঝে কল্যাণীকে বড় ভয়। কল্যাণী এখন যেতে পারে, নাও যেতে পারে—সবটাই কল্যাণীর মর্জির উপর নিভর। ওর কথায় কিছু আসছে যাচ্ছে না।

চা খেতে খেতে কল্যাণী বলল, আমি না গেলে তুমি খুশী হবে?

--খুশী অখুশীর প্রশ্ন না কল্যাণী। তোমাকে আমি কেন যে বুঝতে

পারছিনা। আমি যা কিছু করছি তোমার আমার ভালোর জন্য করছি। প্রতিষ্ঠানের জন্য করছি। এই প্রতিষ্ঠানের যত উন্নতি হবে, তোমার অমল বিমলেরা তত বেশী নিরাপত্তা পাবে। আমি যা কিছু করছি আমার একার জন্য করছি না সকলের জন্য করছি।

কল্যাণীর তখন উত্তর দিতে ইচ্ছা হল না। বয় চা রেখে গেছে। কিছু গ্রীনপিজ সিদ্ধ এবং সামান্য ফলের রস। কল্যাণীর অদ্ভূত সব অভ্যাস। সে গ্রীনপিজ এবং ফলের রস প্রথমে খাবে, সকলের শেষে চা খাবে। চা ঠাণ্ডা না হলে খাবে না। স্বদেশের টেবিলে শুধু ফলের রস। সে এই সকালে কিছু খায় না। অফিসে বের হবার সময় সামান্য আহার। টিফিনে কল্যাণী এবং স্বদেশ একসঙ্গে পেট পুরে আহার করে। তখন ভোজদ্রব্য বলতে নানারকমের রকমারি খাবার। দুপুরটাই স্বদেশ এবং কল্যাণীর সবচেয়ে বেশী কথা বলার সময়। খুব বেশী সময় নিয়ে দুজনে আহার করে। কিন্তু আজ কল্যাণী দেখল স্বদে এখনই যেন দিনের সব কথা শেষ করতে চাইছে। কল্যাণী বড় একটা হাই তুলল। সে বলতে পারত, স্বদেশ তুমি সকলের জন্য করছ কথাটা মিথ্যা কথা। তুমি নিজের জন্য সব করছ। আমার ইচ্ছা অনিচ্ছার দাম কিছু তোমার কাছে থাকছে না। এবার ভেবেছি আমি একটা পাখি পুষব। ছেলেবেলা থেকে কেন জানি স্বদেশ আমার বড় পাখি পোষার সখ। এখনও জানালায় দাঁড়ালে দূরের মাঠে যে সব গাছপালা পাখি দেখি, এবং যে সব পাখিরা আকাশে নিরন্তর উড়ে যায় তাদের দেখার বড় বাসনা আমার। স্বদেশ তোমার সারাদিন ধরে একই কথা, তুমি আমাকে এই যে কেবল বুঝিয়ে আসছ, সবকিছু তুমি প্রতিষ্ঠানের জন্য করছ, আমার জন্য করছ —আমার শুনে শুনে হাই উঠছে, তুমি জেনে রাখ স্বদেশ এসব দেখলে আমার কেন জানি সেই মানুষকে আর ভালবাসতেও ইচ্ছা হয়না।

বস্তুত কল্যাণী বড় আদরের মেয়ে। শিশু বয়স থেকে তার কেবল

মনে হয়েছে—সংসারে কোথাও কোন দুঃখ যেন নেই। পরিপুষ্ট জীবন, জীবন-যাপনে কেবল মনে হয়েছে সেই নীল উর্দি পরা মানুষ —যে তাকে শিশু বয়সে বড় করেছে, যে তাকে মাঝে মাঝে সমুদ্রতীরে নিয়ে যেত অথবা পাহাড়ে এবং হ্রদের পাশে হাঁটতে হাঁটতে যে কেবল বলত, তুমি বড় কল্যাণময়ী, শ্রীময়ী, তুমি মা বড় দয়ালু, এমন হলে মা কিন্তু চলবে না বড় কষ্ট পাবে।

কল্যাণীর মনে হত, সব মানুষেরাই—এই যে যাদের বাড়ির পাশে জলের ফোয়ারা আছে, মসৃণ ঘাসের লন আছে এবং ঘাসের লনে বসন্তের হাওয়ায় পাতা পর্যন্ত পড়তে পারছে না, কেবল রাজকন্যা অথবা বলা যায় সুন্দর উঁচু লম্বা এক কমলা ·রঙের শাড়ী পরা মেয়ে যার পা দুধের মত সাদা, আলতার গাঢ় লাল রঙ যার পায়ে—যে জানেই না এত সুখ এই সংসারে আসছে কোথা থেকে, কেবল যেন স্বপ্নের মত ভেসে যাওয়া—নীল সবুজ অথবা কালো রঙের সুট পরে বাদামী রঙের এক মানুষ এসে ওর বুঝি এবার হাত ধরবে সংসারের যাবতীয় সুখ যে কোথাও রক্ত ঝরে জমা হচ্ছে মেয়েটি তা আদৌ টের পেল না। সে ফানুসের মত নক্ষত্রের ভিতর হারিয়ে যাবার জন্য ঘাসের উপর পায়চারী করতে থাকল।

দুদিন যথার্থই কল্যাণী অফিস কামাই করল। কিন্তু হলে কি হবে—অভ্যাসের দাস, কল্যাণীর ভাল লাগল না। তার সাম্রাজ্য থেকে তাকে কে বা কারা নির্বাসনে পাঠাচ্ছে। কল্যাণী পরদিনই অফিস গেল। স্বদেশ একটু আশ্চর্য হল। কল্যাণী মনে মনে ভাবল একটু এডজাষ্ট করে চলবে—এই ভেবে যখন সে বেল টিপবে ভাবছে তখনই স্বদেশ এসে ঘরে হাজির।

—কিছু বলবে?

স্বদেশ বলল, আসবে বলে ত, কিছু বললে না বাড়িতে।

—বললে কি করতে! কল্যাণী ফাইলপত্র ঘাটতে গিয়ে কিছু কিছু প্রয়োজনীয় কাগজপত্র পেল না।

—এগুলো আমি নিয়ে গেছি।

– কোথায় ?

—আমার ঘরে।

—কেন ?

—কাজ ভাগ করে দিচ্ছ। তোমার আর কষ্ট করতে হবে না।

—তুমি খুব সহৃদয় স্বদেশ।

—শোনো, তুমি অনর্থক এখানে এসে মন খারাপ করবে –আমার ভাল লাগে না।

এবার সরাসরি কথা বলতে চাইল কল্যাণী. তুমি অমলকে দিল্লী পাঠাচ্ছ ?

– পাঠাচ্ছি।

সঙ্গে রমা বলে একটি মেয়েকে পাঠাচ্ছ ?

—পাঠাচ্ছি।

—কেন ?

খুব সহজ হতে চাইল স্বদেশ। তুমি ও সব বুঝবে না।

—আমি সব বুঝি স্বদেশ।

—কি বোঝ ? আমি যা করছি আমার প্রতিষ্ঠানের উন্নতির জন্য করছি।

—আর একজনকে তুমি জাহান্নামে পাঠাচ্ছ।

—না, পাঠাচ্ছি না।

—তবে সঙ্গে মেয়েটি কেন ?

—তুমি তো সব জান। আমাকে আর জিজ্ঞেস করে কি লাভ !

—না, আমি সব জানি না।

—তা হলে জেনে লাভ নেই।

—না জানলে, তুমি জান আমি খুব কষ্ট পাব।

—জানলে আরও কষ্ট পাবে।

—তবু জেনে কষ্ট পাওয়া ভাল।

স্বদেশ এবার ঠাণ্ডা গলায় বলল, এটা অফিস কল্যাণী, বাড়ি নয়। ছেলেমানুষীর একটা শেষ আছে।

—কোন কিছুর শেষ নেই স্বদেশ। শেষ থাকলে অমলের সঙ্গে রমা বলে একটা হাফ্‌গেরস্থ মেয়েকে পাঠাতেনা।

কল্যাণী!

আমি আর ভাবতে পারছি না স্বদেশ।

– তুমি মনে করছ তোমাকে জব্দ করার জন্য করেছি! তা কিন্তু নয়।

—কিছু শুনব না। বলে সে হন হন করে অফিস থেকে বের হবার মুখে একান্ত বিশ্বস্ত কর্মচারি অমলকে বলল, বাড়িতে দেখা করতে।

—তুমি কি কল্যাণী অফিস ডিসিপ্লিন পর্যন্ত মানবে না। রাগে দুঃখে স্বদেশ কেমন হতবাক হয়ে বসে থাকল।

স্বদেশ মনে মনে বলল, কল্যাণী এত বড় একটা লইসেন্স হাতে আসবে - বিনিময়ে কোম্পানী সরকারি কর্মচারীদের একটু তুষ্ট করবেনা সে কি করে হয়

অমল আর রমা যচ্ছে। রমা অমলের স্ত্রীর অভিনয় করবে। ওরা বড় একটা ফ্ল্যাট ভাড়া করবে। স্বদেশ জানে বড় বড় আমলাদের এখন আর সোসাইটি গার্ল পছন্দ নয়। বরং কোন মধ্যবিত্ত পরিবারের সুন্দর বৌটি, যার চোখ বড়, যে আলতা পরে পায়ে এবং কপালে বড বড় করে সিঁদুরের ফোঁটা দেয় কুললক্ষ্মীর মতো চেহারা এবং লজ্জা অথবা বিনয়ের শেষ নেই যার কিছুটা পর্দার আড়ালে দেখা যাবে, কিছুটা দেখা যাবে না, চুরির ঠুং ঠুং শব্দ কানে ভেসে আসবে— উদ্যোগ ভবনের সেই মুখার্জী সাব - যিনি বড় সদাশয় ব্যক্তি, যার হাতে আমেরিকান লোন ফাণ্ডের কয়েক কোটি টাকার লাইসেন্স—তাকে শুধু বশ করা। অনেকে আসছে। মাদ্রাজ থেকে আসছে ছটা পার্টি,

বোম্বে থেকে আসছে গোটা দশেক—সকলেই নানারকম মাথায় ফন্দি এঁটে আসছে। মুখার্জী সাহেবের টাকার প্রতি বড় বিতৃষ্ণা। বড় বড় পার্টিতে তিনি যান। ওরা নিশ্চয়ই বড় বড় সব পার্টি দেবে। কিন্তু স্বদেশ অন্যভাবে অমলকে বলল, তুমি জাতে বাঙ্গালী ছোকরা। বৌ নিয়ে যাচ্ছ। পার্টিতে প্রথম বেশ একটা তোমাকে খরচ করতেই হবে। অনেক গুণীজ্ঞানীরা আসবেন। স্বদেশ বলে দিয়েছিল, তোমার মুখ চোখ দেখতে বড্ড সরল মানুষের মত। এটা তোমার এ্যাসেট। তুমি পার্টিতে বেশী মদ খাবে না। খেলে তোমার ঘরে অশান্তি হয় বলবে। এমন চালচলন এবং কথাবার্তা হবে--যেন স্ত্রীকে তুমি খুব ভালবাস, এমন সুন্দর বৌ হয় না, এবার ওকে দিল্লী দেখাতে এনেছ। অনেক কিছু দেখার আছে। দরকার হয় যদি পার মা মাসী পেতে মুখার্জী সাহেবের অন্দরে ঢুকে পড়বে। মনে রাখবে, সব সময় মনে রাখবে রমা তোমার খুব লাজুক বৌ। গড় হয়ে সে মুখার্জী সাহেবকে প্রণাম করবে। কথা একেবারেই বলবে না। সামান্য ঘোমটা থাকবে মাথায়। বোধ হয় স্বদেশ সোজা বাংলায় বলতে পারত, ঘোমটার ভিতর খ্যামটা নাচ দেখেছ কোনদিন? দেখোনি, না দেখলে এবার রমা, মুখার্জী সাহেবকে তা দেখাবে। তুমি কেবল বুদ্ধিমানের মত অভিনয়টা করে যেতে পারলেই হয়। তোমাকে আমি পাঠাতাম না। কিন্তু তোমার এমন সুন্দর চোখ মুখ, তোমার সরল অকপট ব্যবহার মুখার্জীকে ধরতে দেবে না তুমি একটা বড় রকমের কাজ উদ্ধার করতে যাচ্ছ। সাহেবকে সহজে ধরা দেবে না রমা। যখন সব প্রায় আদায়পত্র হয়ে গেছে দেখবে তখন এক রাতের ফুর্তি করিয়ে দেবে।

অমল তখনই বলতে পারত, স্যার আমি এ পারব না। কিন্তু যা সময়কাল, কোথায় আবার চাকরী খুঁজবে। এখানে মিসেস একটু ওকে অন্য চোখে দেখেন। সে শুনেছে ওর কাজকর্ম নিয়ে দুজনের ভিতর কিছু গোলযোগও চলছে। ওপর মহলের ব্যাপার—

সব জানার কথা নয়। তবু দেয়ালেরও কান আছে, সেই দেয়ালই ওকে এমন সব কথা শুনিয়েছে। সে এমন অবস্থায় কি করবে ভেবে পাচ্ছে না। একবার যাবে নাকি মালকিনের কাছে! সব খুলে বললে কেমন হয়! কিন্তু অমল শেষ পর্যন্ত এমন একটা কদর্য ঘটনার কথা খুলে বলতে সাহস পেল না। সে আজ কিছুতেই দেখা করতে যাবে না ভাবল। দেখা হলেই সে যেন গোটা ব্যাপারটা খুলে বলে দেবে।

সেদিন রাতে বাড়ি ফিরে কল্যাণী খুব হাসফাঁস করছিল। সে অমলকে ডেকে কিছু বলতে পারত, অমল ওর কাছে এসে দাঁড়ালেই কেমন ভীতু ভীতু মুখ করে ফেলে। অথবা অমল যখন খুব সাহসের সঙ্গে কথা বলবে ভাবে --তখনও অমলকে দুর্বল মনুষের মত দেখায়। অমলের গায়ের রঙ কালো--অমল লম্বা। অমল সব সময় ফুল হাতা সার্ট পরে। টাইয়ের রঙ কেন জানি অমল সব সময় লাল রাখে। জুতো ওর খুব চকচকে, চুল ছোট করে ছাটা। ডান হাতের কড়ে আঙুলে একটা সাদা শংখের আংটি। সে বাড়ি ফেরে অন্যমনস্ক-ভাবে অমলের কি কি সংগুণ আছে— যার জন্য অমল আর কর্মচারী থাকছেনা, অমলকে কাছে রেখে লালন করার ইচ্ছা এসব ভাবার সময়ই মনে হল অমলের হাত বড় লম্বা। থাবা খুব মোটা, অমলের চোখের ভিতর কল্যাণী দেখল, কি যেন আকাঙ্খার বাতি জ্বলে। সেই বাতি সে যেখানেই গোপনে জ্বলতে দেখেছে—স্থির থাকতে পারে নি।

কল্যাণী রাতে ঘুমোতে পারেনি। স্বদেশ শুয়ে শুয়ে টের পাচ্ছিল। যেন কল্যাণী এ-পাশ ও-পাশ করছে, কল্যাণী মাঝে মাঝে যে ঢোক গিলছে তার শব্দ পর্যন্ত সে শুনতে পাচ্ছিল। কল্যাণী ঘুমোলে সে এ-খাট থেকে টের পায়। তখন কল্যাণী চিৎ হয়ে শোয়। সোজা পা দুটো ছড়ানো থাকে। চুলগুলো বালিশের পাশে ঝুলতে থাকে। বুকের ওপর হাত—যেন কল্যাণী সব সময় ঘুমের ভিতর ঈশ্বরের কাছে কি

প্রার্থনা করছে। কল্যাণী ঘুমিয়ে গেলে অনেকদিন স্বদেশ মৃদু নীলাভ আলোটা জ্বেলে কল্যাণীকে ভালভাবে দেখেছে - কি যে রহস্য এই মেয়ের মনে, কি যে চায়, সে ঠিক বুঝতে পারে না। সে কল্যাণীকে আরও দু দুবার এমন সব সামান্য মানুষের দুঃখে মুষড়ে পড়তে দেখেছে। বাধ্য হয়ে স্বদেশ খুব কৌশলে ওদের অন্যত্র বদলী করেছে। কাছে রাখেনি ওদের।

স্বদেশ দেখল কল্যাণী পা গুটিয়ে শুয়ে আছে। নীল আলোটা সব সময় জ্বলেনা। সেটা জ্বালানো নেভানো কল্যাণীর কাজ। ওর খাটেই সুইচ। সে দরকার মত নিভিয়ে দেয়। একবার ভাবল বলবে, কল্যাণী আলোটা নিভিয়ে দাও। একবার মনে হল--- এই যে রাগ অথবা দুঃখ নিয়ে জেগে আছে কল্যাণী একবার মাথার কাছে বসে আদর করবে নাকি?

কল্যাণী অমলকে দেখা করতে বলেছে, অমল সন্ধ্যায় আসেনি। মনে মনে পরাজয়ের গ্লানি, অথবা স্বদেশই দায়ী এ-জন্য, সে অমলের জন্য এমন কষ্ট বোধ করছে কেন। ওর যেন কি হারিয়ে যাচ্ছে। যেন এক উৎসর্গীত প্রাণ অমলের। ওর ইচ্ছা হচ্ছিল সব কিছুতে আগুন লাগিয়ে দিতে। সে যেন আর স্বদেশের দিকে মুখ তুলে তাকাতে পারবে না। কি নিষ্ঠুর মানুষ স্বদেশ। সে উঠে পায়চারী করল। কিছুক্ষণ বেলকনীতে বসে থাকল। জল খেল টিপয় থেকে, তারপর শুয়ে আবার ঘুমোবার চেষ্টা করলো। ঘুম এলনা। মনে হল স্বদেশ সব লক্ষ্য করছে। স্বদেশ কি মনে মনে এখন হাসছে? সে কি টের পেয়ে গেছে - যেমন একবার সে টের পেয়েছিল প্রিয়নাথ নামক এক যুবাকে আমি পছন্দ করছি না, বড় স্বার্থপর মানুষ, হিসেবি মানুষ, প্রিয়নাথের অযথা জল ঘোলা করার স্বভাব ছিল - এখন সে বার বার স্বদেশের সেই করুণ এবং সরল অকপট মুখ মনে করার চেষ্টা করল। কিন্তু কিছুতেই সরল অকপট মুখ ভেসে উঠলনা চোখে। চোরের মতো অথবা দস্যুর মতো, কিম্ভূত কিমাকার মুখ। ঘৃণায় কল্যাণী

গুটিয়ে আসল। এবং মাঝরাতে স্বদেশ কল্যাণীর খাটে উঠে এলে সে শক্ত হয়ে পড়ে থাকল। ঘৃণায় জন্য স্বদেশকে কেমন তার অপরিচিত বলে বোধ হল। ওর হাত সাপের মত ঠাণ্ডা। ওর শরীর ভয়ে কাঠ। তার কোন সাড়া শব্দ মিলল না।

স্বদেশ বলল, তুমি এমন একটা সামান্য ব্যাপার নিয়ে এমন করবে আমি বুঝতে পারিনি।

বস্তুত স্বদেশের ভিতর কল্যাণীকে আদর করার ইচ্ছা জাগছে। এই আদর করার স্পৃহা জাগলেই সে কল্যাণীর প্রায় সব কথাতেই সায় দিয়ে যায়। কল্যাণী শরীরের ভিতর অসামান্য এক লাবণ্য ধরে রেখেছে। কল্যাণী, কি উঁচু আর লম্বা, এমন মেয়ে—যার ঘাড় গলা দেখলে কেবল ছুঁতে ইচ্ছা হয়,—তুমি আমাকে ছুঁয়ে বেড়াও, অথবা সহ মোরে করুণা করে এমন ভাব। আর এ জন্যই স্বদেশ কেন জানি প্রায়ই কল্যাণীর সব আবদার রক্ষা করার চেষ্টা করে। কল্যাণীর ভিতর এক যাদুকরী ভালবাসা আছে, যা ফেলে খুব বেশীদূর যাওয়া যায় না। মায়ের মত স্নেহ এবং করুণা দিয়ে সে সংযমকে সব সময় রক্ষা করতে ভালবাসে। অশুভ কিছু দেখলেই কল্যাণীকে পাগল পাগল দেখায়। স্বদেশ কল্যাণীর এই রূপটা চেনে। প্রিয়নাথের সঙ্গে যখন সব ঠিক তখন কল্যাণীর এই রূপটাই সব ঐশ্বর্য ফেলে কল্যাণীকে ওর কাছে নিয়ে এসেছিল।

সে যেন নিজের কাছেই এবার নিজে হেরে যাচ্ছে, যদি অমলকে না পাঠালে চলত, পাঠাত না। অথবা প্রয়োজনে অন্য লোক এ কাজ করে আসতে পারে। তাছাড়া ওর কানে এ-কথাটা গেলই বা কি করে। এ-সব ব্যাপারে খুব গোপনীয়তা রক্ষা করা হয়ে থাকে। এ-সব ব্যাপারে ওরা তিনজন বাদে আর কেউ জানার কথা নয়। কল্যাণী টের পেল কি করে। সে কল্যাণীর মাথায় হাত রাখল। কল্যাণী যেন মৃত। কোন সাড়া দিল না। কল্যাণীর মুখের কাছে মুখ নিয়ে চুমু খেল। কল্যাণী তেমনি পড়ে আছে। স্বদেশ ভিতরে

ভিতরে বড় উত্তেজনা বোধ করছে। প্রায় আগুনের মত শরীর কল্যাণীর। একবার স্পর্শ করলে রক্ষা নেই। সমস্ত শরীর উত্তেজনায় থর থর করে কাঁপতে থাকে। সে কল্যাণীর কাছে আরও ঘনিষ্ঠ হল, —একি, কল্যাণী কিছুই বলছে না। যেন চেতনা নেই, মৃতপ্রায়।

সে এবার মরিয়া হয়ে বুকের কাছে টেনে নিল, নানাভাবে কল্যাণীকে উত্তেজিত করতে চাইল, যত সে চেষ্টা করছে, তত কল্যাণী ঠাণ্ডা মেরে যাচ্ছে। তত কল্যাণীকে মৃত মনে হচ্ছে। সে আর ধৈর্য্য ধরতে পারলনা। কল্যাণী মুখে হাত রেখে হাউ হাউ করে তখন কাঁদছিল।

কেউ অপরাধ করে ধরা পড়লে যেমন সব তাড়াতাড়ি লুকিয়ে ফেলার চেষ্টা করে, স্বদেশও তেমনি তাড়াতাড়ি সব কিছু লুকিয়ে ফেলার জন্য ঘর অন্ধকার করে দিল। তারপর কোন রকমে শরীরটাকে ঠেলতে ঠেলতে নিজের খাটে নিয়ে গেল। কারণ কল্যাণীর খাটের দিকে আর তাকাতে সাহস করল না। কল্যাণীকে এখন মৃত ব্যাঙের মত দেখাচ্ছে। সে যেন যথার্থই আজ কল্যাণীর ভালবাসাকে হত্যা করে এই ঘরে চুপচাপ আলো নিভিয়ে দিয়েছে। এমন জোর জবরদস্তি করে, ঠাণ্ডা এক শরীরের উপর এই প্রথম যেন সে একটা কুৎসিৎ আচরণ করে ফেলল। লজ্জায় সে মুখ তুলতে পারল না।

ভোরবেলা সে কিছুতেই মুখ তুলে কথা বলতে পারল না। কল্যাণী চুপচাপ সারাক্ষণ একটি কথাও না বলে বেলকনীতে কাটিয়ে দিচ্ছে। চোখেমুখে ক্লান্তির ছাপ। যেন সে কত রাত এমনভাবে না ঘুমিয়ে কাটিয়ে দিচ্ছে। দুবার স্বদেশ এই বেলকনীতে ঘুরে গেছে। কিছুতেই কোন কথা বলতে সাহস পায়নি। একবার সে শুধু দেখেছে—কল্যাণী, অনেক দূরে, মাঠ পার হলে নদীর অন্য পারে কিছু পাটকলের চিমনী, সেইসব চিমনী থেকে ধোঁয়া উঠছে, সেইসব চিমনী পার হলে নীল

আকাশ, আকাশ প্রান্তে কিছু পাখি উড়ে যাচ্ছে, পাখি উড়ে যেতে দেখলেই তার কোথাও চলে যেতে ইচ্ছে হয়—কোথাও গিয়ে, ঠিক কোন আশ্রমের মত জায়গায় --বুঝি সেখানে কোন কোলাহল থাকবে না, সেখানে কোন স্বার্থচিন্তা থাকবে না এবং স্বদেশের মত অমানুষ থাকবে না—সেই এক নির্ঝর শুধু থাকবে অমলিন যা কিছু, যা কিছু সুন্দর, অর্থাৎ সেই যে বলে না, সে ফুলের মত স্বপ্নের এক জগৎ দেখেছিল তেমনি এক জগৎ, ভালোবাসার জগৎ থাকবে শুধু— অন্য কিছু থাকবে না—কেবল সেই জগতের জন্য ওর এখন পাখি হয়ে উড়ে যেতে ইচ্ছা হচ্ছে। পাশে বার বার কেন জানি অমলের অসহায় মুখ চোখের উপর ভেসে উঠছিল- বুঝি এই অমল তাকে তেমন এক জগতে এখন নিয়ে যেতে পারে।

সকাল সকাল স্বদেশ অফিসে বের হয়ে গেল। বের হবার আগে দু তিনবার, শুধু দু তিনবার কেন—বার বার চেষ্টা করেও কথা বলতে সাহস পায়নি। মুহূর্তে স্বদেশ যেন সেই গুপ্তসাহেবের এ্যাসিস্টেন্ট। কল্যাণী তার মেয়ে। তটস্থ একভাব। অথবা কল্যাণীর চোখে মুখে স্বদেশ প্রচণ্ড এক ঘৃণা ফুটে উঠতে দেখল। যত এই ঘৃণার ভাব সে লক্ষ্য করল তত নিজের মধ্যে গুটিয়ে গেল। কোন কথা না বলে- অপরিচিত মানুষের মত সে অফিসে বের হয়ে গেল। অন্যদিনের মত গাড়ির শব্দটা তার কানে গেল না।

স্বদেশ বের হয়ে গেলেই কল্যাণীকে চঞ্চল দেখালো। এবার সে নিরুদ্দেশে পাড়ি জমাবে। তার হাতে এখন সব খবর আছে। এখন দশটা বাজে, আর একটু পরেই ট্রেন। অমল এবং রমা যাচ্ছে।

সে বয়কে শুধু বলল, গাড়ি বের করতে। ওর নিজের ড্রাইভারকে ডেকে পাঠাল। তাকে কিছু নির্দেশ দিল কল্যাণী। তারপর যেমন অন্যদিন বের হয়ে যায়, কল্যাণী তেমনি বাড়ি থেকে চুপচাপ বের হয়ে গেল।

ড্রাইভারকে এনে বড় একটা হোটেলের সামনে ছেড়ে দিল।

সাধারণ মেয়ে এখন কল্যাণী। সে পথচারীদের সঙ্গে মিশে গেল। কেউ টেরই পাবে না, যদি না ওর এমন লাবণ্যময় শরীর দেখাতো— এ-মেয়ে গুপ্তসাহেবের। আদরে আদরে মাথাটি একেবারে গেছে।

ষ্টেশনে গাড়ি ছাড়ার ঠিক আগে উঠে গেল কামরাতে। প্রথম শ্রেণীর একটা কামরাতে ঢুকতেই দেখল শুধু রমা বসে আছে। এখনও অমল এসে পৌঁছায়নি। রমা কল্যাণীকে দেখেই আঁৎকে উঠল। সে কি করবে তখন ভেবে পেল না। কিন্তু কল্যাণীর মুখে চোখে বিরূপ কোন ভাব সেই। সে শুধু বলল, তুমি যাচ্ছ?

রমা থতমত খেয়ে গেল। কোন উত্তর করতে পারল না।

—অমল কখন আসছে।

—এক্ষুনি আসবে।

—তুমি অমলের বউ হয়ে ঠিক অভিনয় করতে পারবে ত?

—পারব।

—কোন ভুলচুক হবে না ত!

—আজ্ঞে না।

—কত পাবে এ-জন্যে। হুজুর কত দিয়েছেন?

রমা চুপ করে থাকল।

—কত দিয়েছেন।

—অনেক। কাজ হাসিল হলে আরো দেবেন।

তোমার মা বাবা জানেন তুমি এমন একটা নোংরা কাজ করতে যাচ্ছ।

জানেন।

—জেনে তোমাকে যেতে দিচ্ছেন?

রমা উত্তরে অনেক কথা বলতে পারত। কিন্তু বলল না। বললে কিভাবে নেবে কল্যাণী সেন, তার যেন জানা ছিল না। সে প্রায় করজোড়ে বসে থাকার মত বসে থাকল।

সংসারে এমনই হয়। রমা, সাধারণ এক মেয়ে ছিল. তার ঘর ছিল

স্বপ্ন ছিল। তার এখন সব গেছে। সে এখন এমন এক মেয়ে সংসারের,
—যার যা কিছু আশা, যেমন কোন কোন সময় সে বৌ হয়, কোন
কোন সময় সে বান্ধবী সেজে অনেক দূরে মাড়োয়ার নন্দনদের সঙ্গে
চলে যায়। তারপর ওকে নিয়ে—একটু সময় পেলেই, একটু আল্গা
হতে পারলেই খাবলে খুবলে খেতে থাকে। এবারে সে অমলবাবুকে
নিয়ে যাচ্ছে। অমলবাবু কোন্ পাপের মুখে ফেলে দেবে কে জানে।
সে কেমন থাবা সানাচ্ছে কে জানে। তবু সেই যে বলে না ঠাণ্ডা
মৃত অবস্থায় ভয় আছে নীতি আছে এবং দুঃখের ভিতর কোন রকমে
বাতি জ্বালিয়ে রাখা, সে শরীরের বাতি জ্বালিয়ে ওদের খাবলা খুবলির
অন্ধকারটাতে একটু আলো দিতে চায়। রমা কল্যাণীকে দেখে
এ সব বলতে পারত। আমি মায়ের জাত বলতে পারত, আমি
ভালবাসাবাসির খেলা খেলি। আমার জীবনে আর ভালবাসার মানুষ
আসে না। ঠিক ট্রেন ছেড়ে দেবার মুহূর্তে অমল এসে উঠল। বাক্স
পেটরা সব ঠিক প্রায় স্ত্রী নিয়ে হাওয়া বদলের চেহারা, কিন্তু
কামরাতে কল্যাণীকে বসে থাকতে দেখেই একেবারে বিস্ময়ে
হতবাক হয়ে গেল।—আপনি! ওর গলা দিয়ে আর কোন শব্দ বের
হল না। চোখ গোল গোল হয়ে উঠল।

-- আমি। কল্যাণী চোখ নামাল না। স্থির চোখে বলল, আমি
কল্যাণী সেন।

- আপনি নামুন। অমল কেমন সাহস পেয়ে গেল। ট্রেন
এক্ষুণি ছেড়ে দিচ্ছে

কল্যাণী এবার উঠে পড়ল। দরজার সামনে গিয়ে যেন নামবার
মত ভঙ্গী করল।

তারপর কি ভেবে বলল, সব ঠিকঠাক করে নিয়েছ ত?

—সব নিয়েছি। আপনি নামুন। হুইসিল দিচ্ছে। আপনাকে
আমি বাড়ি পৌছে দিতাম। কিন্তু এ গাড়ি ফেল করলে সব আপসেট

হয়ে যাবে। হাতে একটু সময়ও নেই যে মিঃ সেনকে ফোন করে দেব।

—অমল! কল্যাণী একেবারে সেই যে বলে না অফিসের মিসেস সেন, ঠিক তেমনি ধমক দিল।

গাড়ি ছেড়ে দিল।

—আপনি আমাদের সঙ্গে কোথায় যাবেন! অমল এমন বলতে গেলে দেখল কল্যাণী এক জামা কাপড়ে, পাশে ছোট্ট একটা এটাচী।

কল্যাণী কোন কথা বলল না। জানালা খুলে চুপচাপ গ্রাম মাঠ দেখতে থাকল। যেন সে কোথাও যাচ্ছে না। শুধু এই ট্রেনে এই জানালার পাশে একটু সময় বসে থাকতে এসেছে।

অমল ভয়ঙ্কর অস্থির হয়ে উঠল। ট্রেন ডিসষ্ট্যাণ্ট সিগন্যাল পার হয়ে চলে এসেছে। হু হু করে ছুটছে। কল্যাণীর কোন হুঁস নেই। রমা প্রায় থরথর করে কাঁপছে। কি একটা অঘটন ঘটবে এই মুহূর্তে সে যেন ধরতে পারছে না। সে কেবল মাঝে মাঝে চোখ তুললেই নির্লিপ্ত চোখ দেখছিল কল্যাণীর, যেন কোন হুঁস নেই।

একটা বড় ষ্টেশনে গাড়ি থামলে কল্যাণী সেন সম্বিত ফিরে পেল। এটাচীটা খুলে একটা বাণ্ডিল বের করে রমাকে দিয়ে দিল। বলল, এই ষ্টেশনে নেমে যাও। মিঃ সেন যা দেবে কথা ছিল—আমি তার ডবল দিলাম। আর কোন কথা নয়। বেশী কথা বললে, পুলিশ ডেকে সব ফাঁস করে দেব। যাও।

রমা নেমে গেলে অমল স্থির, প্রায় যেন বজ্রাহতের মত এক মানুষ সে, সে বজ্রাহতপ্রায় দাঁড়িয়ে থাকল। সে বলতে পারত, কল্যাণী তুমি এটা কি করলে। কেন তুমি এমন যেচে আত্মহত্যা করলে। আমার জন্য তুমি কেন এতবড় কলঙ্ক টেনে আনলে।

কল্যাণী এবার হাসতে হাসতে বলল, কি, খুব ভয় লাগছে?

অমল সেই অসহায় চোখ নিয়ে কল্যাণীকে দেখল। চোখ মুখ পাণ্ডুর দেখাচ্ছে। কেমন সাদা সাদা।

কল্যাণী এবার সাহস দেবার মত বলল, যেমন সে স্বদেশকে এক সময় অনুপ্রাণিত করেছিল জীবনে, ঠিক তেমনি অমলকে অনুপ্রাণিত করতে চাইল।

কিন্তু অমল স্পষ্ট বলে ফেলল, আপনি একি করলেন!

—কিচ্ছু করিনি অমল। আমি আবার বাঁচতে চেয়েছি। কল্যাণীর চোখ ছল ছল করতে লাগল।

তারপর যেন ওর বলার ইচ্ছা, আমরা উভয়ে সেই নদীটিকে খুঁজে বেড়াব, যেখানে কেবল নির্মল জলে নীল আকাশের ছবি ভাসে। যেখানে কোন মালিন্য নেই অমল। আমরা সামনের একটা ষ্টেশনে নেমে যাব। কিছু আহার করে কোন আশ্রমের মত জায়গায় গিয়ে বসবাস করব। আমি আর সেই স্বার্থপর দৈত্যের কাছে ফিরে যাব না।

স্বদেশ নিমেষে সব মনে করে ফেলতে পারল। এই বৃষ্টির রাতে স্বদেশ এক পাহাড়ী শহরে এসে খুব ক্লান্ত বোধ করছে। কল্যাণীর প্রতি তার এক নিদারুণ আকর্ষণ। জীবন থেকে হারিয়ে যাবার পর মনে হয়েছে বড় অমূল্যনিধি তার হারিয়ে গেল। সে তার স্ত্রীকে পাগলের মত খুঁজে খুঁজে ফের কল্যাণীর ভিতর তার পুরণো ভালবাসাকে খুঁজেছিল অথবা বলা যেতে পারে কল্যাণী শরীরে এক মণিমুক্তোর ঘর লুকিয়ে রাখে—কেবল ঔদার্যে ভরা ওর সেই পরম বস্তুটিকে কেবল স্পর্শ করার বাতিক স্বদেশের। অর্থের প্রাচুর্য স্বদেশকে অন্য যুবতীর সঙ্গে ভালবাসাবাসির খেলায় মেতে যেতে সাহায্য করেনি। সে যেন কল্যাণীকে হারিয়ে জীবনের সব ভালবাসা হারিয়ে কেমন দুঃখী মানুষ বনে গেল। এখনও তাই মনে হয়, কল্যাণী কতদিন অমলের সঙ্গে গৃহত্যাগী, তবু যদি ফিরে আসে তার

প্রাসাদ ফুলে ফলে ভরে উঠবে। যেখানে কল্যাণী গেছে, সেখানে সে ছুটে ছুটে গেছে। কল্যাণীকে বার বার অর্থ সাহায্য করতে চেয়েছে।

কল্যাণী স্বদেশের অর্থ সাহায্য নিয়ে বাসা বদল করে অন্যত্র নিরুদ্দেশ হবার চেষ্টা করেছে। একমাত্র অমল, যাতে তারা তলিয়ে না যায়, গোপনে স্বদেশকে চিঠি দিয়ে রক্ষা করে আসছে। অমলের যেন ভয়, এমন সুখী প্রাণ সরল ভালবাসার পাগলামীতে না ভেসে যায়। কারণ অমল ধরে ফেলেছিল, জীবনে উদ্যমশীল হলেই জটিলতা, নানাভাবে ঘোলা জলে ডুবে মরতে হয়। কল্যাণী ফের তবে পাখি হয়ে আকাশের মুক্ত হাওয়ায় উড়তে চাইবে। যেমন প্রিয়নাথ এবং স্বদেশকে ত্যাগ করে সে এখন অমলের সঙ্গে ঘর করার জন্য কি আপ্রাণ চেষ্টা! যেন খোলামকুচি মিলে গেছে, পুতুলের মত ঘর তৈরী করে নিয়ে নিজের ইচ্ছামত সন্তান লালন করা। কল্যাণী বস্তুত সকলকে সন্তানের মত সাহচর্য দিয়ে লালন করতে চায়। উদ্যমশীল মানুষ মাত্রেই কেন জানি তখন বড় স্বার্থপর বলে মনে হয় তার।

স্বদেশ এইজন্য মাঝে মাঝে কল্যাণীকে নির্বোধ ভাবত। সবকিছু পরিত্যাগ করার স্বভাব। নাকি কল্যাণীর এমন জীবন যাপনে অন্য সুখ আছে? অথবা বুঝি স্বদেশের প্রাণে গুপ্তসাহেবের মেয়ে এক গভীর প্রেমের সন্ধান দিয়েছিল। থেকে থেকে তা মনে হলেই স্বদেশ স্থির থাকতে পারে না। পাগলের মত ছুটে আসে। অর্থাৎ এই অবলা মেয়ের কি যে সুখ জানা নেই। ওকে আলোতে পথ দেখাতে হবে। প্রথম দিকে জোর জুলুম এবং কোর্ট কাচারী করার ভয় যে না দেখিয়েছে তা নয়—কিন্তু যখনই মনে হয় কল্যাণীর ভিতর এক ভালবাসার পাগল রয়েছে, এই পাগল তাকে প্রিয়নাথ থেকে স্বদেশ এবং স্বদেশ থেকে অমল—সে নানা ভাবে কল্যাণীকে সময় সময় অনেক দূরের পাহাড়ে সূর্যোদয় দেখাতে চেয়েছে—বলতে চেয়েছে, এ ভাবে জীবনযাপন চলে না। কিন্তু কল্যাণী সরল বালিকার মত

সব চুপচাপ শুনে ভেবে দেখবে বলত। তারপর ফের উদ্দেশ্যহীন হয়ে পড়া এবং নিজেকে নিরুদ্দেশ করে রাখতে ভালবাসত।

অমল দুরারোগ্য ব্যাধির কবলে পড়ে গেলে বড় অসহায় বোধ করতে থাকল। যেন কল্যাণীকে এখন কেউ এসে রক্ষা করুক, নতুবা কল্যাণী যা করছে, অমলের সব দুঃখ দু'হাতে মুছিয়ে দেবার জন্য কি প্রাণপণ চেষ্টা! অথচ কল্যাণীর দুর্বার ক্ষুধার কথা ভাবলে ভয় হয়। কতদিন আর কল্যাণী নিজের এই ক্ষুধাকে গোপন করে রাখতে পারবে। মানুষ থেকে মানুষে এই ক্ষুধা পরিবর্তনশীল জগতের মত নিরন্তর যেন ছুটছে। কল্যাণীর এই স্বভাব। এবং মনে মনে অমলের। এই মেয়ে ফের অন্য ভালবাসায় পড়ে যেতে পারে এবং তলিয়ে যেতে পারে। সে গোপনে সংযোগ রক্ষা করল স্বদেশের সঙ্গে। ওর স্বভাবের কথা খুলে বলল, স্যার, মনে রাখবেন কল্যাণীদি আপনার স্ত্রী। আমার সঙ্গে একটা যে সম্পর্ক আছে তা অস্বীকার করবো না— তবু যখন দেখি তিনি ফের অন্যমনস্কভাবে জানালায় চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকেন তখন বুকটা আমার কাঁপে। কেন জানি তিনি নিজেকে নিঃশেষ করে দিতে পারলে তৃপ্তি পান। এমন অদ্ভুত চরিত্রের মেয়ে আমি জীবনে দেখিনি স্যার।

শেষ চিঠি অমলের—অমল লিখেছে, স্যার, আমার সময় শেষ হয়ে আসছে। কল্যাণীদি হয়ত ফের কোন উদাসীন এবং নির্বিকার মানুষের অন্বেষণে থাকবেন। যাকে তিনি লালন করবেন, ভালবাসবেন এবং ইচ্ছামত ভোগ করবেন। আপনি এ-সময়ে ওকে রক্ষা না করলে বড় ক্ষতি হবে। মনে রাখবেন, কল্যাণীদি আপনার স্ত্রী এবং গুপ্ত-সাহেবের মেয়ে।

স্বদেশ বলল, আজ রাতটা শুধু থাকব কল্যাণী।

—কোথায় থাকবে বল। ঘরদোরের যা অবস্থা, তুমি থাকবে কি করে?

—এটা তোমার আমাকে থাকতে না দেওয়ার অজুহাত।

কল্যাণী কি বলবে ভাবল। কিন্তু বলতে দ্বিধা করায়, কল্যাণীকে বিষণ্ণ দেখাচ্ছে।

—ভোরের দিকে আমাকে ডেকে দেবে।

—তুমি কিছু খাবে না? বলে কল্যাণী অমলের ঘর থেকে কি বের করে আনল। বলল, তুমি বসো, আমি একটু আসছি।

—আমার জন্য ব্যস্ত হতে হবে না।

—ব্যস্ত না হলে চলবে কি করে! আমি আর অমল। ওর অসুখে আমার সব শেষ। ঝি চাকর বলতে কেউ নেই। সব দেখেশুনে আমিই করছি।

স্বদেশের বলতে ইচ্ছে হল, তুমিতো একজন মৃত মানুষকে আগলাচ্ছ। আমি জানি না তুমি কি পেলে ওর ভিতর। আমি ইচ্ছা করলে জোর করতে পারি, জুলুম করতে পারি, সম্পর্কচ্ছেদ করতে পারি, কিন্তু যখনই মনে হয় তুমি গুপ্তসাহেবের মেয়ে সব বৈভব ফেলে আমার কাছে ছুটে এসেছিলে—তখন আর স্থির থাকতে পারি না। সব জেনেও তোমার বিরুদ্ধাচারণ করিনি। কারণ তোমার মুখ মনে পড়লেই সে রাতের হাউ হাউ করে কান্নার কথা মনে পড়ে। আমার জন্য তোমার শরীরে কোথাও কিছু ভালবাসার অবশিষ্ট ছিল না। নিজের স্ত্রীকে আমি রেপ করেছি। সে অপরাধ আমার হাজার মহিমায়ও মুছবে না।

স্বদেশের বলতে ইচ্ছা হল. আমাকে ত্যাগ করার পর প্রথম প্রথম পাগলের মত তোমার অনেক বিরুদ্ধাচারণ করি। তারপর মনে হয়েছে সব বৃথা। দ্বিধাহীনভাবে স্মৃতিতে কেবল সেই রেপের দৃশ্য দেখে দেখে ক্রমে আমি অস্থির হয়ে উঠেছি। আর সেই থেকে

নতুনভাবে আমি যেন তোমাকে ভালবাসতে চেয়েছি। সকলে বলত আমায়, পাগল স্বদেশরঞ্জন, দ্বিচারিণী বৌকে সন্তানের মত ভালবাসে।

কল্যাণীকে বাঁধা দিল স্বদেশ। বলল, আমার জন্য ব্যস্ত হতে হবে না।

কল্যাণী কিছু বলল না। সে যেমন যা করে থাকে, প্রায় তেমনি কিছু করবে ভেবে ও-ঘরে চলে যাচ্ছে।

স্বদেশ ফের বলল, শোনো কল্যাণী।

কল্যাণী তাকাল না। দাঁড়িয়ে থাকল।

স্বদেশ কাছে গিয়ে বলল, কিছু খাব না। শরীরটা ভাল নেই। বরং একটু ঘুমোব। রাত থাকতে কিন্তু ডেকে দেবে।

কল্যাণী ভেতরে অসহায় বোধ করে। মানুষটাতো ঘুম কাতুরে। সকাল আটটা না বাজলে ওর ঘরে যাবার নিয়ম ছিল না। বারোটা পর্যন্ত রাত জাগার স্বভাব তার। এবং ঘুমোলে মরা। সেই মানুষ রাত থাকতে ডেকে দিতে বলছে।

স্বদেশ বলল, অসুবিধা হলে থাক।

কল্যাণী দাঁতে দাঁত চেপে বলল, না।

কল্যাণী আর একটা কথা বলল না। পাশের ঘরে বিছানা করে দিল। অভিমান এত বেশি যে, সে আর একটা প্রশ্ন করতে পারছে না। অভিমান, না সেই লোভী মানুষের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ অথবা এও হতে পারে, কল্যাণী ভেতরে ভেতরে নিজের ভুল বুঝতে পারছে— স্বদেশ কল্যাণীর মুখ দেখে কিছুই বুঝতে পারছে না। সে একটা ইজিচেয়ারে তখন চুপচাপ ক্লান্ত মানুষের মতো পড়ে আছে।

আর সহসা কি হয়ে যায় স্বদেশের, কারা যেন বাড়িঘর সত্যি তল্লাসি করতে চলে এসেছে। সে ছুটে সদরের দিকে গেল, দরজা খুললে দেখল তেমনি নিঝুম। সামনের পার্ক, রাস্তা অথবা দিঘীর জলে, দূরের পাহাড়ে মায়াবী চাঁদের সামান্য জ্যোৎস্না। সে কিছুক্ষণ সেখানে দাঁড়িয়ে থাকল।

কল্যাণী পরেছিল সামান্য ছাপা শাড়ি। ওর সিঁদুর জ্বল জ্বল করছে। বড় পবিত্র মুখ। মানুষটা কিছু খাবে না, ভাবতে কষ্ট হচ্ছিল। কেন খাবে না, কি হয়েছে, রাত থাকতে চলেই বা যাবে কেন, সে কেমন অস্থির হয়ে উঠছিল ভেতরে ভেতরে। আর এই যে দ্রুত উঠে চলে গেল, কেমন সন্তর্পণে চলাফেরা তার— সে ভয়ে ভয়ে জানালায় গিয়ে দাঁড়ালে দেখল, মানুষটা সত্যি আর দাঁড়াতে পারছে না; যেন ভেতরে তার এক ভারি কষ্ট। সে দরজা অতিক্রম করে বাইরে এসে দাঁড়াল। বলল, ভেতরে এস। শোবে।

স্বদেশ চারপাশে কি সন্তর্পণে দেখছে।

কল্যাণী বলল, কি দেখছ ?

—তোমাদের এখানে……

—আমাদের এখানে কোন ভয় নেই।

—কেউ রাতে আসে ?

—কে আসবে !

—কেউ ডাকে ?

—কি বলছ যা তা !

—তুমি শুনতে পাওনি, কেউ ডাকছে স্বদেশবাবু আছেন !

—নাতো।

—তোমরা কিছু শুনতে পাওনা !

স্বদেশের দিকে কল্যাণী আশ্চর্য দিশেহারার মতো তাকাচ্ছে. সে বলল, তুমি ভয় পাচ্ছ কাকে ?

—কেউ আসতে পারে। দরজা খুল না।

—কে আসবে !

—ঠিক জানি না।

কল্যাণী চিৎকার করে উঠল, স্বদেশ প্লিজ আমাকে ভয় পাইয়ে দিও না। তুমি ভেতরে এস।

প্রায় কল্যাণী স্বদেশকে জোরজার করে ভেতরে নিয়ে গেল।

স্বদেশ কেমন এক জরদ্গব মানুষের মতো বাহ্যজ্ঞান শূন্য। এখন কল্যাণী যা যা বলবে সে অবোধ বালকের মতো তাই করে যাবে।

কল্যাণী বলল, তোমার কি হয়েছে!

কিছুই তো হয় নি!

—তবে এমন করছ কেন?

—কি করেছি!

আবার মনে হল কেউ ডাকছে। স্বদেশ ছুটে দরজার দিকে যেতে চাইল। কল্যাণী বলল, আবার কোথায় যাচ্ছ!

—শুনতে পাচ্ছ না।

—কি শুনতে পাব?

—ঐ যে ডাকছে। স্বদেশবাবু আছেন এখানে?

কল্যাণী বুঝতে পারল কিছু একটা হয়েছে। কোথাও কেউ ডাকছে না, তবু বার বার স্বদেশের মনে হচ্ছে কেউ ডাকছে।

কল্যাণী বলল তোমার মাথা ঠিক নেই। তোমার কিছু হয়েছে!

স্বদেশ সামান্য হাসল। কল্যাণী ঠিক জানে না, সে শেষবারের মতো কেন চলে এসেছে। কিছু একটা হয়েছে বৈকি। তার এতসব আছে, অথচ কল্যাণী নেই বলে কিছু নেই। কল্যাণী পাশে থাকলে পুলিশের হাঙ্গামাকে সে থোরাই কেয়ার করত। কল্যাণী এভাবে চলে এসে সব তার যেন শেষ করে দিয়েছে। সে এখন কোনো শব্দ পেলেই সতর্ক হয়ে যায়। ট্রেণে বাসে যখন যেখানে যে-ভাবে ছিল, তার মনে হয়েছে পুলিসের লোক তাকে অনুসরণ করছে।

কল্যাণী বলল, চান করে নাও।

স্বদেশ কল্যাণীর কথামত চান করে নিল।

একটু গরম দুধ খাও।

স্বদেশ ভীষণ উদাসী মানুষের মতো সবটুকু দুধ খেয়ে ফেলল।

স্বদেশের চোখমুখের অস্বাভাবিকতা ক্রমে কল্যাণী টের পাচ্ছে।

প্রথমত সে এটা বুঝতেই পারে নি। এখন কেন জানি মনে হচ্ছে, অমল এবং স্বদেশ প্রায় কাছাকাছি মানুষ। ফারাক নেই। তার আবার আগের পুরোনো স্বদেশের চোখ মুখ মনে পড়ছে। ঠিক তেমনি নিস্তেজ অসহায় মুখ। সে বলল, তুমি বিশ্রাম কর। আমি কিছু ভাতে ভাত করে দিচ্ছি।

স্বদেশ এবার কেন জানি আর বারণ করতে পারল না। সে বুঝতে পারছে, ক্ষুধার্ত্ত। স্নায়ুতে অস্বাভাবিক চাপের দরুন সে কিছু গোলমেলে কাজ করে ফেলেছে। সারাক্ষণ সে ছুটছে, সেই দিন থেকে, সে ছুটছে। ছুটতে ছুটতে শেষ আশ্রয় পেয়ে গেলে যেমন মানুষের আর কোন দুঃখ থাকে না, তেমনি স্বদেশ দুঃখহীন। এবং বিশ্রামের জন্য সোফায় বসে থেকে নীল আকাশ দেখতে পেল জানালায়। কিছু নক্ষত্র।

তখন মনে হল কেউ তাকে সত্যি ডাকছে। সে বুঝতে পারছিল, আসলে অমল খুব রুগ্নগলায় ডাকছে, স্যার একবার এদিকে আসবেন। মৃদু গলা। কল্যাণী ওদিকের ঘরে ওর খাবারের বন্দোবস্ত করছে। সময় বুঝে অমল এক ফাঁকে কাছে ডেকে নিতে চাইছে।

সে উঠে দাঁড়ল।

মিনমিনে গলায় অমল ও-ঘরে আবার ডাকছে—স্যার।

সে পর্দা ঠেলে ও-ঘরে ঢুকে গেল।

—আমাকে ডাকছ।

অমল কিছু বলল না। শুধু তাকিয়ে থাকল।

স্বদেশ অমলকে এবার ভালভাবে দেখল। খুব নিস্তেজ। কথা বলতে কষ্ট। কপালে ঘাম। চোখ বিবর্ণ।

অমল বলল, বসুন স্যার।

একটা মোরা টেনে স্বদেশ পাশে বসল। চোখ টেনে দেখল অমলের। শরীরে রক্ত নেই বুঝতে পারল। কাশি উঠলে এখুনি রক্তবমি করবে বোধ হয়। সে একটু দূরে বসেছে। কঠিন অসুখ।

আবার ভাল হয়ে উঠবে কিনা সে বুঝতে পারছে না। এমন রুগ্ন পাণ্ডুর একজন মানুষকে নিয়ে কল্যাণী কি সুখে বেঁচে থাকছে! সে বলল, তুমি আমাকে ডাকছিলে ?

সে কোনরকমে মাথা নেড়ে সম্মতি জানালে। .

—তাই মনে হচ্ছিল কেউ ডাকছে। সামান্য সময় চুপচাপ থেকে বলল, অনেকক্ষণ থেকে ডাকছিলে !

সে এবারেও সম্মতি জানাল।

-–তাই। কেবল মনে হচ্ছে কেউ ডাকছে।

অমল বলল, আমি আর ভাল হব না স্যার।

—কি যা তা বলছ! আমি যখন এসে গেছি ঠিক একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবেই।

অমলের মুখ আরো পাণ্ডুর দেখাল।

এবং ভেতরে একটা পরাজয়ের গ্লানি স্বদেশ বহন করে বেড়াচ্ছে। সামান্য একজন আমলার কাছে তার পরাজয়, কল্যাণী তার এমন বিত্ত বৈভব ফেলে কত অনায়াসে চলে আসতে পেরেছে। অন্য সময়ে সে কি করত ঠিক যেন বুঝতে পারছে না। এখন অন্তত সে কিছু করতে পারছে না। বরং ওর পাণ্ডুর দুর্বল মুখ দেখে প্রায় সামান্য মায়া হল তার। সে ওর হাত নিয়ে নাড়ি দেখল। যে কোন মূহূর্তে থেমে যাবে ? শুধু অপেক্ষা করা।

অমলের ওপরে এখন আর তার যেন কোনো রাগ নেই। কল্যাণী যাই করে থাকুক, এই অমল বরাবর খোঁজ খবর দিয়ে গেছে। সে যে তার দুঃসময়ে অমলের জন্যই কল্যাণীর কাছে চলে আসতে পেরেছে! এবং সে এখন অমলের মতোই প্রায় অসহায় মানুষ।

বাইরে আকাশ পরিষ্কার। ঝড়ো হাওয়া আর উঠছে না। কেমন সজীব এক গন্ধ। কল্যাণী জানালায় দাঁড়িয়ে দূরের পাহাড়, আলোর চুমকি আকাশে ফুটে উঠতে দেখছে। স্টোভের শব্দ উঠছিল। কাছে কোথাও রাতের পাখিরা কলরব করেই থেমে

গেছে। এখন এই নিরিবিলি পাহাড়ী যায়গায় দূর ভূমণ্ডলের কোনো দ্বীপের মতো মনে হচ্ছে নিজেকে। স্বদেশের কি যে চেহারা হয়েছে! তার কেন জানি ভীষণ কান্না পাচ্ছিল।

আসলে সব মানুষেরই বুঝি থাকে এক আশ্চর্য ভূমণ্ডল। সেখানে সে যেতে চায়, পারে না। কল্যাণী চুপচাপ জানালায় দাঁড়িয়ে মা'র সেই দুঃখের দিনগুলি মনে করতে পারছে। বাবার সেই চরম উদাসীনতা, মা যেন বাড়ির অঙ্গসজ্জার মতো, আর কিছু তার ছিল বাবার মনে হত না। মা দুঃখে দুঃখে মরে গেল। শীর্ণ হয়ে গেল। বাবার ছিল এক অতীভ লোভ, সব কিছুই তার বিত্ত বৈভবের মতো ভেবেছিলেন। মাকেও।

সেই থেকে কেন জানি যা কিছু পরিত্যক্ত, অথবা অবহেলার তার কাছে মহামূল্যের মতো মনে হত। সে সামান্য একটা বেড়াল-ছানার কষ্ট সহ্য করতে পারত না। মার মতো দুঃখী মনে হত বেড়ালছানাটাকে। তাকে নিয়ে বড় করা, তাঁকে পরিচ্ছন্ন করে তোলার ছিল স্বভাব। ওর এখন হাসি পায় সব মনে পড়লে। কি যে ছেলেমানুষী করত! আসলে সেই আশ্চর্য ভূ-মণ্ডলে মানুষ কখনও যেতে পারে না। স্বদেশকে দেখে আবার সেটা বেশি করে মনে পড়ছে।

ভেতরের ঘরে অমল এবং স্বদেশ মুখোমুখী এখন। অমল কি বলবে সে জানে। আসলে অমল ওর শেষ বেড়ালছানা। তাকে সে কত ভাবে যে চেষ্টা করেছে ভাল করে তোলার। পারল না। হেরে গেল। আর এখন বিপর্যস্ত মানুষ স্বদেশ এসে হাজির। কিছু একটা হয়েছে তার। ওর চোখ মুখ ভয়ার্ত। সেই এক অসহায় রাস্তার কুকুর অথবা বেড়ালছানার মতো। ভেতরে মায়া বেড়ে যায়।

অমল বলল, স্যার আপনার শরীর ভাল নেই।

স্বদেশ কিছু বলল না।

কল্যাণী ভেতরে এল। ওর অষুধ খাওয়াবার সময়।

অমল বলল, কি হবে আর খাইয়ে।

কল্যাণী ওকে ওষুধ দিল। এটা ঘুমের ওষুধ। এখন অমলের ঘুমোবার সময়।

স্বদেশকে বলল কল্যাণী, এস।

স্বদেশ উঠে দাঁড়াল।

—ও এখন ঘুমোবে। এস।

কল্যাণী বাইরে এসে বলল, সব দিয়েছি। বাথরুমে সব আছে। বলে সে বাথরুমের আলো জ্বেলে দিল।

স্বদেশ দাঁড়িয়ে থাকল।

কল্যাণী বলল, যাও।

স্বদেশ কোনো কথা বলল না।

—তোমার কি হয়েছে।

স্বদেশ এবারেও কিছু বলল না। বাথরুমে ঢুকে গেল।

কল্যাণী কিছুক্ষণ স্থাণুর মতো দাঁড়িয়ে থাকল। তার খুব একটা অধিকারও নেই জোরজার করার। ভাত ফুটে গেছে। একটু দুধ আছে। কলা আছে: মাখন আছে। সে একটু মুগের ডাল বসিয়ে দিল। ডাল বেগুন ভাজা সব শেষে দুধভাত খুব খারাপ হবে না। সে রান্নাঘরে নিবিষ্টমনে বসেছিল। অনেকদিন পর ওর কেন জানি ভেতরে ভেতরে আবার সেই কষ্টটা কুরে কুরে খাচ্ছে। সে যে কি করবে বুঝতে পারছে না।

স্বদেশ খেতে বসে বলল, এত কেন যে করতে গেলে। কিছুই খেতে পারব না।

—কখন খেয়েছ?

—ঠিক মনে নেই।

অন্য সময় হলে কল্যাণী আর একটা কথা বলত না। আসলে রাগ। রাগে অভিমানে এমন সব বলছে!

—কখন খেয়েছ মনে নেই!

—না কল্যাণী।

—কিছুই খাওনি হয়তো সারাদিনে।

—তাও হতে পারে।

—তবে খাবে না কেন?

—ইচ্ছে করছে না।

—না খেলে বাঁচবে কি করে?

বাঁচব না জেনে ফেলেছি বলতে পারত। সে আবার নীরব।

কল্যাণীর জেদ বাড়ছিল। –তবে এখানে এলে কেন?

—চিঠি পেয়ে।

—অমল তোমাকে জানিয়েছে!

স্বদেশ এবারেও কথা বলল না।

—দুধটুকু খাও! একি উঠে পড়ছ কেন। কিছুই খেলে না!

—কল্যাণী আমি ঘুমোব। কতদিন ঘুমোয়নি।

কল্যাণী এবার ভেঙ্গে পড়ল।

—রাত থাকতে আমায় ডেকে দেবে।

—কোথায় যাবে?

— জানি না।

—এখানে থেকে যাও স্বদেশ। আমি পাগল হয়ে যাব।

—থাকার উপায় নেই। সকালেই হয়তো পুলিশ হানা দেবে।

—পুলিশ!

—তুমি তো জানো লোভ আমাকে কোথায় নিয়ে যেতে পারে। লকার সব সিল করে দিয়েছে। পুলিশ খুঁজে বেড়াচ্ছে। আবার আগের স্বদেশ।

কল্যাণী বলল, তুমি চিন্তা করবে না। আমি আছি।

স্বদেশ বলল, আমি ঘুমোব।

কল্যাণী বলল, এস।

ও-ঘর থেকে তখন অমলের কষ্টের শব্দ ভেসে আসছে। কল্যাণী শব্দটা শুনে চমকে উঠেছে।

স্বদেশ বলল, ফলের রস দাও। ও আজ ঘুমোতে পারবে না।

কল্যাণী ছুটে গেল ও-ঘরে। কেমন হাসফাঁস করছে। গলা শুকিয়ে গেলে এমন হয়। তাড়াতাড়ি সামান্য ফলের রস দিল খেতে। মাথার চুলে বিলি কেটে বলল, ঘুমোও অমল।

রাতের বেলা কখন স্বদেশ ঘুমিয়ে পড়েছিল। কোথাও কোনো পাখি ডাকছে না। যেন সারাটা শহর এক নিভৃত অন্ধকারে ডুবে আছে। বিন্দু বিন্দু সব আলো জ্বলছে। কোথাও কিছু কুকুরের চিৎকার। নির্জন পাহাড়ের মাথায় একটা সাদা রঙের বাড়ি। পাশে মাধবী লতার কুঞ্জ। এবং মনোহর সব ফুলের গাছ চারপাশে। শুধু একজন তখনও জেগে। সে অমলের পাশে রাত জাগছে। অমলের নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। চোখ ঘোলা ঘোলা। অবিরাম কঠিন মৃত্যুর ছায়াপথ তৈরি হয়ে যাচ্ছে। সে একা সব দেখছে। একবার ডেকে স্বদেশকে বলছে না, এস। নিজের তৈরি করা এক সংকল্পের মৃত্যু ধীরে ধীরে দেখছে। স্বদেশ না এলে আরো কিছুদিন হয় তো অমলকে বাঁচিয়ে রাখা যেত। অমল কি মনে মনে টের পেয়েছে ওর শেষ আশ্রয় নষ্ট হয়ে যাচ্ছে!

তারপরই কল্যাণীর মনে হল এই কঠিন সংসারে কোথাও কারা ঘণ্টা বাজিয়ে যাচ্ছে। কারখানার ঘণ্টার মতো কেবল মাঝে মাঝে ছুটির ঘণ্টা বাজছে। হাজার লক্ষ বছর ধরে এ-ভাবে কেবল এক দৈব-ঘণ্টা মানুষের জন্য। অথবা কোন পাহাড়ের মাথায় শেষ ট্রেন হুইসিল বাজাচ্ছে। প্ল্যাটফরম ছেড়ে ট্রেনটা অন্য একটা স্টেশনের উদ্দেশ্যে চলে যাচ্ছে।

স্বদেশের ঘুম ভেঙে গেল। কোথাও কেউ যেন কাঁদছে। অন্ধকারে চুপচাপ বসে থাকল কিছুক্ষণ। মাঝের ঘরে আলো জ্বলছে।

সে উঠে এগিয়ে গেল। পর্দা তুলে দেখতে পেল, অমলের বুকে পড়ে কল্যাণী অসহায় শিশুর মতো কাঁদছে।

স্বদেশ বলল, ওঠো।

কল্যাণী উঠছে না।

স্বদেশ আবার বলল, ওঠো। এটা নিয়তি।

কল্যাণী কাঁদছে না।

স্বদেশ বলল, অমল তোমার কেউ ছিল না।

কল্যাণী স্থির হয়ে গেছে।

স্বদেশ বলল, আমরা নিজেরাই সব তৈরি করে নিই।

কল্যাণী তবু উঠছে না। স্বদেশের কথা সে সন্তর্পণে শুনছে

স্বদেশ বলল, আমরা দুঃখ ছাড়া বাঁচতে পারি না।

কল্যাণী এবারে সরে এল বুক থেকে। ওর চুল এলোমেলো। চোখ কেমন ফুলে গেছে। লাল।

স্বদেশ বলল, এই দুঃখটুকু আছে বলে বেঁচে সুখ। দু বছর আগে অমল বলে তোমার কেউ ছিল না। দু বছর পরে মনে হয়েছে, অমল ছাড়া পৃথিবীতে তোমার কিছু নেই।

কল্যাণী এবারে সাদা চাদর দিয়ে অমলের মুখ ঢেকে দিল।

স্বদেশ বলল, আমার জন্য ভাবতে হবে না কল্যাণী। সকালে যাওয়া হচ্ছে না। অমলের কাজ-টাজ আছে।

কল্যাণী তাকিয়ে থাকল।

—ওরা আমার আর কি ক্ষতি করতে পারবে। এবারে সকাল হতে দাও। সূর্য উঠতে দাও। বলে সে বাইরে বের হয়ে এল। কল্যাণীকে সঙ্গে নিয়ে এল।—দরজা জানালা খুলে দাও। সকালের বাতাস আসুক। আমার আবার ঘুম পাচ্ছে। কতকাল ঘুমোয়নি। সে সত্যি ঘুমোতে যেন চলে গেল। ঘরে অমলের মৃতদেহ আছে কে বলবে।

॥ সমাপ্ত ॥